নবযুগের আহ্বান

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাধনাশ্রম
২১০।৬ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সাধনাশ্রম হীরকজয়ন্তী গ্রন্থমালা

তরুণগণের প্রতি উপদেশাবলী

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক শ্রীননীভূষণ দাসগুপ্ত
২১।১৬ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

জীবন ও ধর্ম্ম

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—জগতে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করে নাও, অর্থাৎ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে অভ্যস্ত হও, এই উপদেশটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে কি পরিবর্ত্তন এনেছিল, আমরা তা জানি। ঈশ্বরপিপাসু মনের স্বভাবই এই যে, সে যেখানে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না, সেখানেই এক গভীর অসুখ, গভীর অতৃপ্তি অনুভব করে। পৃথিবীর দু' একটি মন্দিরে দু' একটি তীর্থস্থানে তাঁকে দেখে সে সুখী হয় না, সমগ্র বিশ্বে দেখতে চায়। তেমনি কালের অংশবিশেষে তাঁকে দেখেও সে তৃপ্ত হয় না; শুধু সত্যযুগে নয়, শুধু মহাপুরুষদের আবির্ভাব সময়ে, তাঁদের এবং তাঁদের পারিপার্শ্বিক ভক্তমণ্ডলীর জীবনে নয়: সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে, তাঁর লীলা দেখে সে সুখী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের আশ্চর্য্য উন্নতি মানবচিত্তকে যত সম্পদে সম্পৎশালী করেছে, তার মধ্যে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করতে শিখিয়ে তাকে যে তৃপ্তি দিয়েছে, তার সঙ্গে তুলনীয় আর কিছু নাই।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্রের প্রসার আরও বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান যুগে দেখতে পাই, মানুষের সকলের চেয়ে বেশী আগ্রহ করে জানবার ও অনুসন্ধান করবার বিষয় হয়েছে জীবন। শরীর ও মন, দুই নিয়ে মানুষের যে জীবন,—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, স্বাস্থ্য, নানা বাসনা, নানা আকাঙ্ক্ষা, ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, নানা সুখ দুঃখ ও মানুষে মানুষে নানা সম্বন্ধ, সব নিয়ে যে জীবন,—এ জীবনকে

মানুষ সকলের চেয়ে বড় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের চেয়ে বড়, পৃথিবীর পর্ব্বত সমুদ্রের চেয়ে বড়, অতীতের সকল কাহিনীর চেয়ে বড়, এই মানবজীবন।

এই 'জীবন' কথাটি মানুষের চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করে সকল চিন্তাকে পরিবর্ত্তিত করে তুলছে। সমাজতত্ত্বে এ কথাটি প্রবেশ করেছে। আগে ছিল, বড় ছোট, উচ্চ নীচ, সকলের অধিকার ঠিক করে দেওয়াই সমাজতত্ত্বের প্রধান কথা। এখন তার বদলে এই কথা শুনতে পাই, যারই জীবন আছে, তারই জীবনের পূর্ণবিকাশের অধিকারও আছে। তাই অনুন্নত জাতিদের আর চেপে রাখা যায় না; জীবনের পূর্ণ-বিকাশের যে সকল সুযোগে তারা এখন বঞ্চিত, সে সকল তাদের দিতে হবে। 'জীবন' কথাটি পরিবারের ব্যবস্থাকে নূতন করে তুলছে। গুরুজন ও জ্যেষ্ঠদের প্রতি ছোটরা কি রকম ব্যবহার করবে, ছোটদের প্রতি বড়দের কি রকম ব্যবহার হবে, এই ছিল আগে পরিবারের প্রধান প্রশ্ন। এখন প্রধান চিন্তনীয় বিষয় এই যে, কি করে পরিবারের প্রত্যেকটি জীবনকে, বিশেষতঃ ছোটদের জীবনকে বিকাশ করা যায়। পরিবার এখন জীবনের বিকাশের ক্ষেত্র। এই 'জীবন' কথাটি রাজনীতিতেও প্রবেশ করেছে। শুধু দেশের শান্তিরক্ষা নয়, কিন্তু দেশের মানুষ যাতে মানুষ হতে পারে এমন করে তাদের শিক্ষা দেওয়া ও জীবনে সফলতা লাভের সুযোগ প্রস্তুত করে দেওয়া রাজার কাজ বলে এখন স্বীকৃত হচ্ছে।

'জীবন' কথাটি মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করেছে। মানুষ কি করে জ্ঞান লাভ করে, এ প্রশ্নের উত্তরে লোকে আগে বলত, হয় ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা, নয় অধ্যয়ন, চিন্তা, ধ্যানের দ্বারা; বড় বিষয় হলে বলত, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা। এখন জ্ঞানীরা বলছেন, মানুষ জ্ঞান পায়

কাজ করে। we know *by doing.* কোন বিষয়ে যদি ঠিক জ্ঞান পেতে চাও, তবে পড়ে-শুনে, ভেবে, বুঝে, সন্তুষ্ট হয়ো না। জানা, চিন্তা করা, এমন কি, গভীর ভাবে চিন্তা করা অর্থাৎ ধ্যান করা, এ সকলের কিছুই যথেষ্ট নয়। করে দেখ, তবেই ঠিক জ্ঞান লাভ করবে। নিজে ছবি আঁক, নিজের হাতে মূর্তি গড়, তবে বুঝবে সৌন্দর্য্য কাকে বলে। নিজে দায়িত্বপূর্ণ কাজ নাও, বুঝবে দায়িত্ব কাকে বলে। এই যে তত্ত্বটি, (কি না, মানুষ কাজ করে জ্ঞান পায়,) এটির আরও পরিণত রূপ হল এই যে, মানুষ জীবন দিয়ে জ্ঞান পায়; we know *by living.* শুধু খেটে নয়, জীবিত থেকে। খাটা, কাজ করা, এ তো জীবনের এক অংশমাত্র। কিন্তু শ্রম, বিশ্রাম, সুখ, দুঃখ, আশা, ভয় প্রভৃতি নিয়ে মানুষের যে জীবন,—এই জীবনের নূতন নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করে তবে মানুষ একটু একটু করে জ্ঞানে বাড়ে। আমরা শুধু খেটে শিখি না, ঠেকে শিখি, ভুগে শিখি, সুখী হয়ে শিখি, ভালবেসে শিখি, ভালবাসা পেয়ে শিখি, অন্যের ভার নিয়ে শিখি, আবার নিজের ভার অন্যকে দিয়েও শিখি। এক কথায়, জীবনে যা কিছু ঘটে, যা কিছু পাই, সকলেরই মধ্য দিয়ে শিখি। জীবনই হল জ্ঞানের ভিত্তি।

যে মানুষ কখনও কাহাকেও ভালবাসা দেয় নাই, যার মন কখনও ভালবাসার স্রোতে পড়ে তোলপাড় হয় নাই, সে প্রেমের কি বুঝবে? তাকে যদি দেবতা বলেও বিশ্বাস করি, তবুও বলতে পারব না যে সে, প্রেমকে জেনেছে। মানুষ দেবভাব দিয়ে ভালবাসতে শেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে ভালবাসতে শেখে না, মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করে ভালবাসতে শেখে না, তপস্যা করে ভালবাসতে শেখে না, দিবানিশি পরের জন্য খেটেও ভালবাসতে শেখে না। একমাত্র ভালবেসেই ভালবাসতে

শেখে, ও ভালবাসা কাকে বলে তা বুঝতে শেখে। সে-জীবনের মধ্যে পড়, তবেই তা বুঝবে। তেমনি, যে মানুষ সত্যকার সংগ্রামে পড়ে নাই, সে বীরত্ব কাকে বলে তা বুঝতে পারে না। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে পারে, সঙ্কল্পের উৎসাহে উচ্ছ্বসিতও হতে পারে ; কিন্তু তাকে যদি সত্য সত্যই বীরত্ব শিখাতে চাও, তবে এ সকলে বেশী সময় ক্ষেপ না করে সত্যকার কোনও সংগ্রামে ফেলে দাও। সে-জীবনের মধ্যে সে পড়ুক, তবেই তা শিখবে। জীবনই শিখায়।

'জীবন' কথাটি মানবচিন্তার আর সকল বিভাগে এমন করে প্রবেশ করেছে, ধর্মচিন্তার উপরেও যে এর প্রভাব এসে পড়বে তা আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম আর এখন ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মত, বিশ্বাস, ভাব, বা চিন্তায় আবদ্ধ নয় : মানুষের সমগ্র জীবনকে ঈশ্বরসংস্পৃষ্ট ও ঈশ্বরানুগত করাই ধর্ম। পরিবার, সমাজ ও ধর্মমণ্ডলী, এই তিনের মধ্যে মানুষের জীবনে গূঢ়তম ও গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে,—পরিবার। এজন্য, ধর্মজীবনের রক্ষা ও বিকাশের পক্ষে, সমাজ ও ধর্মমণ্ডলী অপেক্ষা পরিবারকে অধিক মূল্যবান জেনে তার উন্নতির ও সৌন্দর্য্যবিধানের দিকে প্রধান মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগে ঈশ্বরপিপাসু মানুষের মন সমগ্র জীবন দিয়ে ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে চায়, সমগ্র জীবন ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করতে চায়। 'ঈশাবাস্যমিদং জগৎ' শুধু নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, 'ঈশাবাস্যমিদং জীবিতম্'। মানবের ধর্মভাব যতক্ষণ শুধু চিন্তা ধ্যান ও আরাধনার পথ দিয়ে ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরের শাশ্বত স্বরূপ সকল নিয়েই সে থাকে ; ঈশ্বরের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি স্বরূপ সে ধর্মভাবকে পুষ্ট করে। কিন্তু জীবন তো শুধু চিন্তা ধ্যান আরাধনাতেই শেষ নয়। জীবন এ সকলকে ছাড়িয়ে আরো কত বড়। জীবন তাই

শুধু স্বরূপগুলিকে নিয়ে তৃপ্ত হয় না; জীবন চায় জীবনব্যাপী সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ,—মানুষে মানুষে যেমন সম্বন্ধ হয়।

পৃথিবীতে বন্ধুর কাছে মানুষ কি চায়? প্রথমতঃ, তাঁর মন পেতে চায়। বন্ধুকে সে যেমন চায়, বন্ধুও তাকে তেমনি চান, এই সে আশা করে। বন্ধুকে পেয়ে তার যে আনন্দ, তাকে পেয়ে বন্ধুরও তেমনি তৃপ্তি, এ কথা সে বুঝতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, তার জীবনে কোনও নূতন অবস্থা এলে সে চায় যে, বন্ধুও তার নূতন জীবনে তার সঙ্গী হোন। তৃতীয়তঃ, মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে জীবনের সব বিষয়ে সঙ্গী করতে চায়। দুই বন্ধুর সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, পতি পত্নীর সম্বন্ধ, সবই, জীবনের যত বেশী বিষয়ের উপরে ব্যাপ্ত হয়, ততই ভাল। যত কাজে, যত চিন্তায়, যত সংগ্রামে, যত আনন্দে, যত বিকাশের পথে, দু'জন পরস্পরের সঙ্গী হতে পারে, ততই তাদের সম্বন্ধ সরস ও সতেজ হয়। জীবনে প্রেমের ভিত্তি যত বিশাল, প্রেম ততই সুদৃঢ় ও উন্নত হয়।

বর্ত্তমান যুগে ভক্তপ্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে এই তিন লক্ষণযুক্ত প্রেমের সম্বন্ধ পেতে উৎসুক। সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হবে, এই ভক্তপ্রাণের আকিঞ্চন। ভক্তপ্রাণ দেবতাকে বলে, 'আকাশের এমন এক বিন্দু নাই, যা তোমার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়; কালের এক মুহূর্ত্ত নাই, যা তোমার দ্বারা পূর্ণ নয়, আমার জীবনে কি শুধু এক উপাসনায়-ধ্যানে তুমি থাকবে, তা ভিন্ন আর সকল জীবন কি তোমা ছাড়া হয়ে থাকবে? যদি তোমা-ছাড়া করেই রাখবে, তবে এ সব দিলে কেন? এত সুখ দুঃখ দিলে কেন? হাসি কান্না দিলে কেন? এত কাজ, এত মায়া মমতা দিলে কেন? ক্ষুধা দিলে কেন,—যার জন্য এত খেটে মরতে হয়? কেন সমস্ত জীবনটা শুধু উপাসনাময়, ধ্যানময় করে দিলে

না? উপাসনায়-নিমীলিত নয়ন যাতে আর খুলতে না পারি, এমন করে জীবন রচনা করলে না কেন?'

শোনা যায়, সেকালে জগতের অসাধারণ মানুষেরা তাঁদের জীবনে ঈশ্বরের স্পর্শ পেতেন। তাঁরা হয় তো সংসার ছেড়ে, শুধু জগতের সেবা ও ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকতেন। কিন্তু আমাদের জীবন থেকে কিছু বাদ দেবার উপায় তো ঈশ্বর করে দেন নি। আমরা খাটব, অথচ খাটবার সময় তাঁকে পাব না, তিনি এ সাধারণ জীবনের সাধারণ খাটুনিতে দেখা দেবেন না, তাঁর প্রসন্ন হাসি দেখে আমাদের পরিশ্রম আনন্দে পরিণত হবে না, ক্লান্তির সময় তাঁর স্নিগ্ধদৃষ্টি আমাদের গায়ে বুলিয়ে দিয়ে সমস্ত অঙ্গের শ্রান্তি তিনি হরণ করবেন না,—এ কি প্রাণ সহ্য করতে পারে, মানতে পারে?

ভক্তপ্রাণ ঈশ্বরকে জীবনের সব অবস্থায়, সব ঘটনায় পেতে চায়, কেবল বাছা-বাছা কয়েকটি সময় পেলে তার চলে না। শুধু তাই নয়; সে বুঝতে চায় যে, ঈশ্বর আমার জন্য আছেন। আজ উষাকালে পূর্ব্বাকাশ যখন সোণার আভায় রঞ্জিত হয়ে আমাকে মুগ্ধ করছিল, তখন তিনি কি আমাকে লক্ষ্য করে, আমাকে মনে করে, আমার নয়ন মন হরণ করবার অভিপ্রায় করে, এমন সুন্দর শোভা প্রকাশ করছিলেন? আমার প্রাণটা যখন ঐ শোভা দেখে দেখে তাঁর দিকে প্রেমভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, সেই মুহূর্ত্তে তাঁর লক্ষ্য, তাঁর মনোযোগ কি আমার দিকে ছিল? তিনি কি আমার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলেন?—না, ঐ-শোভা তাঁর সাধারণ এক ক্রিয়াতে হল, যাতে আমাকেও মনে করা হয় নি, জগতের কোনও মানুষ বা কোনও জীবকে পৃথক করে মনে করা হয় নি? ঐ উষায় তাঁর একই চক্ষু কি আমাদের প্রত্যেকের দিকে বিশেষ কথা নিয়ে তাকায় নি? যা শুধু

আমার উপযোগী এমন একটু আদর, এমন একটু উৎসাহ, এমন একটু উপদেশ বা তিরস্কার নিয়ে আমার দিকে তাকায় নি?

তার পরে দেখতে পাই, আমার জীবনে নিশিদিন কত বিচিত্র অবস্থা আসছে। আমি কখনো সুখী, কখনো দুঃখী; কখনো থাকি কর্ম্মকোলাহলে, কখনো নির্জ্জনে বিশ্রামে; কখনো থাকি গভীর জ্ঞানচর্চ্চায়, কখনো পৃথিবীর কোনও প্রেমাস্পদের কাছে, প্রেমের আনন্দ-স্পন্দনে। বন্ধু যেমন জীবনের সব বিচিত্রতায়, মনের সেই-সেই অবস্থার উপযোগী হয়ে বন্ধুর সঙ্গে মেশেন, ঈশ্বর কি আমাদের জীবনের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তাই করেন না? তাঁর সঙ্গে যে সম্বন্ধ চায়, তার মন এর চেয়ে কমে তৃপ্ত হতে পারে না। সম্বন্ধ জিনিষটার স্বভাবই এই যে, সে নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকার নেয়। এ না হলে পূজা সম্ভব হয়, ধ্যান আরাধনা সম্ভব হয়, কিন্তু আপনার ব'লে জীবনে পাওয়া সম্ভব হয় না।

তবে আমরাও কি আমাদের এই সাধারণ জীবনের সব অবস্থায় তাঁকে পেতে পারি? কয়েকটি অবস্থা দিয়ে এ কথা চিন্তা করা যাক্।

যখন অতি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কোনও কাজের ভার পড়ে, কত বার এমন হয় যে, প্রাণপণ শ্রম করেও পেরে উঠি না, মনে ভয় হয় বুঝি আমার হাতে পড়ে কাজটি খারাপ হয়ে গেল। আবার অন্তরের সংগ্রামে পড়ে কত সময় ক্লান্ত আকুল হয়ে পড়ি, হয় তো অবস্থাটা কোনও বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবারও সাধ্য থাকে না। মুখ বুজে, ঠোঁট চেপে, জগতের দিকে কর্ণ বধির করে, দাঁতে দাঁতে পিষে, কোনও রকমে মনের বল রক্ষা করে সংগ্রাম করে যাই। শরীর মনের এই তুমুল সংগ্রামের মধ্যে ঈশ্বর কি দেখা দেন? তাঁর সঙ্গ দেন?—দেন বই কি? তিনি তখন প্রভু, সেনাপতি; আমি তাঁর সৈনিক। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া

যাক। নেপোলিয়নের সৈন্যদল র‍্যাটিস্‌বন (Ratisbon) নগর অবরোধ করছে; নেপোলিয়ন ঈষৎ আহত বলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে রয়েছেন, যুদ্ধের সংবাদ জানবার জন্য উদ্বিগ্ন রয়েছেন। এমন সময় একজন তরুণ সৈনিক দ্রুত অশ্বারোহণে তাঁর কাছে এল। সে আহত মুমূর্ষু, কিন্তু সম্রাটকে যুদ্ধজয়ের সংবাদ না দিয়ে সে মরবে না, এই তার পণ। তাই সে সারা পথ চেপে মুখ বন্ধ করে ছিল, পাছে মুখে রক্ত উঠে প্রাণ বাহির হয়ে যায়। অশ্ব হতে অবতীর্ণ হয়ে সে বল্গা ধরে কোনও রকমে শরীরকে খাড়া রেখে সম্রাটকে সংবাদ দিল যে, তাঁর জয় হয়েছে। 'ঐ দেখুন আপনার জয়পতাকা, আমি নিজ হাতে নগরের প্রাচীরে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছি।' নেপোলিয়ন, বিজয়সংবাদে মুহূর্ত্তের জন্য উৎফুল্ল হ'য়ে পরক্ষণেই আবার সেই যুবার বিবর্ণ মুখ দেখে স্নেহ-করুণ স্বরে বললেন, 'বৎস, তুমি আহত?' সৈনিক প্রাণদানের গর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্য তার মৃতপ্রায় দেহ উন্নত করে বলল, 'না মহারাজ, আমি মৃত'; আর অমনি তার প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।... আমরা যখন প্রাণপণ সংগ্রাম করে কোনও কঠিন কর্ত্তব্য পালন করে যাই, তখন আমরা তাঁর সৈনিক, তিনি মহারাজ হয়ে, সেনাপতি হয়ে অমনি করে আমাদের কাছে থাকেন; অমনি করে স্নেহের স্বরে তাঁর সন্তোষ, তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন। সে-স্বর শুনে প্রাণ দিতেও মানুষ গৌরব অনুভব করে। শুধু যে ধর্ম্মসংগ্রামেই তাঁকে পাই, তা নয়। আমাদের সংগ্রাম যত নিম্নস্তরেরই হোক না কেন,—দারিদ্র্যের সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, মানুষের প্রতিকূলতার সঙ্গে, জন্মগত কোনও অক্ষমতার সঙ্গে, যার সঙ্গেই হোক,—সেনাপতিরূপে প্রভুরূপে কাছে তাঁকে পাব, এতে সন্দেহ নাই।

যখন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে বসি, সেখানে

দেখি, মা হ'য়ে তিনি রয়েছেন ; তাঁর মাতৃস্নেহ নানা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছে ; খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, বিশ্রামের ব্যবস্থা করছে, হাসি দিয়ে, গল্প দিয়ে, শরীর মনের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়ে, তপ্ত প্রাণকে সুস্থ করে তুলছে। তিনি সেখানে মা,—আর তিনি সেখানে ব্যস্ত মা। আবার যখন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একান্তে গিয়ে আকাশের তলে বসি, তখন সেই মা যেন আবার শান্ত মূর্ত্তিতে এসে ধীরে ধীরে আমায় কোলে করে বসেন। শান্ত প্রেমের স্পর্শ দিয়ে, শুধু সেই প্রেমের অনুভবেরই মধ্যে আমাকে নিমগ্ন করে রাখেন। পৃথিবীর মা যেমন কত সময় চান, সন্তান শুধু তাঁর কোলে বসে থাকুক,—শুধু তাঁর স্নেহ-সুধা, অঙ্গের স্পর্শের আকারে সন্তান তার সমগ্র চেতনা দিয়ে পান করুক, তেমনি স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমাদের পরমজননী তাঁর স্নেহের স্পর্শ আমাদের শরীর মনে ঢেলে দিতে চান, তাঁর প্রেমের কোলে আমাদের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে নিয়ে শুধু নীরবে বসে থাকতে চান। সেই কর্ম্মহীন শ্রান্তি-অলস অবসরের মধ্যেও তাঁকে পেয়ে অতি উচ্চ অনুপ্রাণনের অবস্থায় থাকতে পারা যায়।

নারী রন্ধনশালার কাজে মহাব্যস্ত, নানা খুঁটিনাটি কাজ তাঁর, ছোট ছোট সহস্র বিষয়ে নিমেষে নিমেষে তাঁকে মন দিতে হচ্ছে, কত দিকে একই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে,—এ কাজের মধ্যে কি এ-কাজেরই উপযোগী হয়ে ঈশ্বর দেখা দেন না?—দেন বই কি! পৃথিবীর মা কত সময়ে মেয়ের হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'তুমিই আজ সকলকে খাওয়াও দেখি!' মেয়ে মার আদেশ পেয়ে আনন্দে পরিশ্রম করে, যত্ন করে, সে কাজটি করতে থাকেন ; মা আবার বারে বারে দেখে দেখে যান, আর আদর করে বলে যান, 'তুমি আজ আমার কাজ করছ, তুমি আজ ছোট্ট মা হয়েছ। তেমনি,

তিনি রান্নাঘরের কাজের সময় মা হয়ে কাছে এসে আদর করে বলে যান, 'আজ তুমি আমার মূর্ত্তি নিয়েছ, আজ তুমি ছোট্ট মা হয়েছ।' তাঁর সে আদর পেয়ে পেয়ে যিনি কাজ করতে পারেন, তাঁর সে কাজ করা কত মিষ্টি হয়ে যায়।

রোগে শোকে কষ্টে তিনি মা হয়ে কাছে থাকেন। মার কাছে রয়েছি বলে রোগের কষ্ট শোকের কষ্ট ভুলে যাই, মার কাছে চোখের জল ফেলে মনের ভার লঘু করি। সুখের সময় তাঁর হাসি সুখকে পবিত্র করে দেয়, দুঃখের সময় তাঁর সান্ত্বনা দুঃখকেও প্রিয় করে দেয়। জীবনের কোন্ অবস্থায় তিনি কোনও না কোনও মূর্ত্তিতে কাছে নাই ?

সত্যই কি তবে জীবনের সব ব্যাপারে তিনি সঙ্গী ? খেলায় কি তাঁকে পাওয়া যায় ? যায় বই কি ? আমাদের স্নেহের শিশুরা যখন মাঠে কলরোল করে খেলা করে, তখন তাদের ছোট ছোট হাত-পা-গুলির মধ্যে যে-আনন্দ যে-স্ফূর্ত্তি খেলে বেড়ায়, তা তাঁরি দেওয়া, তা দেখতে তিনি ভালবাসেন ; বাতাসে শুষ্ক পাতা উড়িয়ে দিয়ে, মাটীতে রোদের ও ছায়ার চঞ্চল ছবি এঁকে দিয়ে, ফুলের শোভা মাঠের শোভা দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের তিনি নিজে কত খেলা দেন। বড় হয়ে তুমি যখন ব্যায়াম কর, তরঙ্গের মত তোমার সুগঠিত মাংসপেশীর ওঠা নামা দেখতে তিনি ভালবাসেন। দিনে দিনে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা তিনি এত যত্নে নিজে গড়ে দিয়েছেন, যখন সুপুষ্ট সুঠাম সুগোল হ'য়ে ওঠে, তার সৌন্দর্য্য দেখে তিনি সুখী হন। আমাদের খেলায়, ব্যায়ামে, তাঁকে কাছে পাই বই কি !

তিনি কি কৌতুকেও সঙ্গী ? আমার তো মনে হয়, তিনি আমাদের হাসি বোঝেন, কৌতুকের হাসি দেখতে ভালবাসেন। তিনি নিজেই যে হাসান ! তেঁতুলের ফুলটিকে একপাশে বাঁকা করে, তার

গায়ে ঠিক্ সঙের মত কতকগুলি রঙের ফোঁটা দিয়ে দিয়েছেন। নারকেলের মালাতে কেমন একটি মুখ এঁকে দিয়েছেন। এ-সকলের দ্বারা তাঁর অন্য উদ্দেশ্যও সাধন হচ্ছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের হাসিটিও তাঁর অভিপ্রায়ের বাইরে নয়। ভদ্রসাজে পথে বাহির হওয়া গেল; এই ঘূর্ণীবাতাসে ধূলো উড়িয়ে দিয়ে আমাদের সভ্য কাপড় চোপড় মাটী করে দিলেন; আবার এই দেখি, সেই ধূলি গোধূলির আকাশে নিয়ে গিয়ে, কি উজ্জ্বল, বিচিত্র, নানা বর্ণের মহিমাময় শোভা সৃষ্টি করলেন!

তিনি আমাদের জ্ঞানান্বেষণে গুরু, তিনিই সুন্দরের মধ্য দিয়ে মন প্রাণ হরণ করেন, তিনিই ভাবে গানে সৌরভে মন মাতান। মানুষ যখন উচ্ছ্বসিত হয়, মাতে, তখন কি তাঁকে পায়? পায় বই কি! তিনিই তো মাতান। জগৎ ও মানবজীবন তাঁর এই মাতানোর দৃষ্টান্তে ভরা। তিনিই ভক্তির উচ্ছ্বাস দিয়ে ভক্তকে মাতান। উৎসব দিয়ে ধর্ম্মমণ্ডলীকে মাতান। তিনিই যৌবনে প্রণয় দিয়ে পুরুষ ও নারীর হৃদয়কে মাতান, সন্তান দিয়ে মাকে মাতান। মায়েরা বলে থাকেন যে, চারদিনের শিশু প্রথম যখন স্তন্য পান করে, তখন শিশুর নেশা হয়, তাই সে অঘোরে ঘুমায়। কিন্তু মারও তো নেশা হয়! যেই শিশুর মুখে স্তন্যদান করেন, অমনি তাঁর মন স্নেহের নেশায় বিভোর হয়ে যায়। পৃথিবীর মা যেমন স্তন্যসুধা দিয়ে স্তনন্ধয় শিশুকে বিভোর করে দেন, তেমনি যতবার যত কিছু নিয়ে আমাদের মন মেতে ওঠে, তার মধ্যে সেই পরমজননীই তাঁর ভাবসুধা দিয়ে আমাদের মাতান। জীবনের উচ্ছ্বাসগুলির মধ্যেও তাঁকে পাওয়া যায়।

কত আর বলব? জীবনে এমন কিছু নাই, যার মধ্য দিয়ে তিনি দেখা দেন না, স্পর্শ দেন না। জীবনের সকল বিচিত্রতার মধ্যে তিনি

আমাদের কাছে নব নব রূপে এসে, আমাদেরও নব নব ভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করতে চান। তিনি যে বেশী দিন আমাদের একভাবে চলতে দেন না, তার কারণ এই-ই। এ জন্যই পুরাতন অভাব পূরণ করে দিয়েই তিনি আবার নূতন অভাবের উদয় করেন। ভক্তের প্রাণ জীবনের এই বিচিত্রতার মধ্যে তাঁকে বলে,—'আমি তোমার সকল বিধির জন্য প্রস্তুত। যখন তুমি যে ভাবে জীবনে আসতে চাও, এস, আমি সকলেরই মধ্যে তোমায় দেখব। তুমি যদি দুঃখ আন, আর আমি সে-দুঃখ যদি বুঝতে না পারি, তবু নীরবে অপেক্ষা করবো; ধীরে ধীরে তোমার প্রেমের আলোকে আমার মনের আঁধার কেটে যাবে, আমি আবার সে দুঃখেরই মধ্য দিয়ে তোমার প্রেমমুখ নূতন করে দেখব। আমি প্রস্তুত। জীবনে তাঁর নূতন বিধির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ যখন নূতন হয়ে আসে, ভক্তের প্রাণ তৎক্ষণাৎ তার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে. আমাদের প্রস্তুত হতে দেরী হয় বলে আমরা শুষ্কতায় পড়ে যাই। যে অবস্থাকে আমরা শুষ্কতা বলি, যাকে প্রাচীনেরা ঈশ্বরের আত্মগোপন বলতেন, তা বস্তুতঃ তাঁর আত্মগোপন নয়, তাঁর প্রকাশের পরিবর্ত্তন মাত্র।

মানবজীবনের কোনও অংশই তুচ্ছ নয়। সমগ্র জীবনই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। জীবনের কোন অংশকে অবহেলা করাও যা, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তির পরিসর সঙ্কুচিত করাও তা। জগতে যতবার মানুষ জীবনের অনেকখানি অংশকে বাদ দিয়ে অল্প অংশের উপরে সাধনের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করতে চেষ্টা করেছে, ততবারই সে বিফল হয়েছে; অল্পপরিসর ভিত্তির উপরে উচ্চ স্তম্ভ কোনও দিন দাঁড়ায় নাই। ঈশ্বর যে-সকল সাধারণ ও স্বাভাবিক বিধির মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তানদের গড়েন, তার কোনটি অবহেলা করলে তার দণ্ড পেতেই হয়। বাল্যে খেলাধুলা

দিয়ে, কৈশোরে জ্ঞানপিপাসা দিয়ে, যৌবনে দাম্পত্য জীবন ও সন্তান পালন দিয়ে, সারাজীবনে নানা দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য ও ভার দিয়ে,—অন্নপান উপার্জ্জনের জন্ত শ্রম করতে দিয়ে,—মানুষকে তিনি গড়েন। শুধু গড়েন বললে ঠিক্ কথা বলা হয় না; এ-সকলের মধ্য দিয়ে তিনি দেখা দেন, স্পর্শ দেন, নিজের সঙ্গে নব নব সম্বন্ধে যুক্ত করেন। এই ভাবে সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁকে যে পায়, তার ধর্ম্মজীবন যেমন বিশাল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন সুদৃঢ়, পরীক্ষা-সহ ও সুশোভন হয়, সঙ্কুচিত জীবনকে মানবের উদ্ভাবিত কোনও সাধনপ্রণালীর সাহায্যে সে রকম করে তোলা সম্ভব নয়।

ধর্ম্মের নূতন আদর্শ আমাদের দায়িত্বকে কত বাড়িয়ে দিচ্ছে! শুধু কয়েকটি সাধন, কোনও নির্দ্দিষ্ট তপস্যা, কোনও বিশেষ যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু সমগ্র জীবন তাঁর দ্বারা পূর্ণ করা, সমগ্র জীবনকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করা, জীবনের সকল সুখ দুঃখে, সকল প্রীতিস্নেহে, সকল গৃহকর্ম্মে ও বাহিরের কর্ত্তব্যে, সকল আমোদ হাসি খেলায়, এমন ভাবে চলা যাতে তাঁর নিত্য স্পর্শ পাই, যাতে তাঁর কোনও ইচ্ছা আমাদের জীবনে প্রতিহত না হয়, যাতে জীবন তাঁর লীলাভূমি, তাঁর নিত্য প্রকাশমন্দির হতে পারে,—তার জন্ত আমরা কি ব্যাকুল হচ্ছি? আমরা কি জীবনের অনেক অংশে তাঁ-ছাড়া হয়ে থেকে, তাঁর স্পর্শ তাঁর অনুপ্রাণন আসতেই পারে না এমন ভাবে আচরণ করে সন্তুষ্ট থাকছি না? হায়, এখনও আমাদের কত কর্ত্তব্য শুধু শ্রমমাত্র রয়েছে, তাঁর কাছে থেকে থেকে তাঁর কাজ করবার যে আনন্দ, তা-হতে বঞ্চিত রয়েছে। এখনও কত সুখ আমাদের লঘু করে; এখনও কত দুঃখ আমাদের নিরাশ ও কঠোর করে তোলে; আমাদের সংসার এখনও কত রকমে তাঁর সঙ্গে নিত্য

যোগের বাধা হয়! এ সকলকে পরিবর্জ্জিত করে সমগ্র জীবনকে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের অনুকূল করে নিতে হবে। এই পূর্ণজীবন লাভের জন্ত যে যত্ন, তা-ই আমাদের সাধন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ধর্ম্মের প্রধান সাধন কি? তবে বলতে হয়,—জীবনে প্রত্যেক বিধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে নব নব প্রকাশ আসচে তা অনুভব করা, মনকে ও জীবনকে সেই প্রকাশ অনুভব করবার অনুকূল অবস্থায় রাখা ও সেই প্রকাশের মধ্যে তাঁর যে আহ্বান আছে তার অনুসরণ করা; আবার, স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, জীবনের নব নব বিকাশ যাতে হয়, জীবন যাতে আরও বিস্তৃত হয়ে তাঁকে নূতন নূতন ভাবে স্পর্শ করতে পারে, তার আয়োজন করা।

তবে এই নূতন আদর্শের আহ্বান শ্রবণ করো। এই নূতন আদর্শ বলছে, জীবনকে বিশাল কর; জ্ঞানকে বহুবিষয়ব্যাপী কর, গভীর কর, তোমার ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্বল ও প্রসারিত হবে। জগতের সকল মহান্ প্রয়াসের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত কর, তোমার জীবন স্বর্গীয় অনুপ্রাণনে নিত্য পূর্ণ থাকবে। যত মহৎ ভাব ও মহৎ আদর্শ দেশে দেশে যুগে যুগে মানবমনকে উচ্ছ্বসিত ও উন্নত করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নম্র জিজ্ঞাসার ভাব নিয়ে সে-সকলের সম্মুখীন হও, তোমার হৃদয় ভাবসম্পদে সম্পৎশালী ও ধর্ম্মজীবন সতেজ হবে। দৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য সকল সামান্ত হোক কি গৌরবময় হোক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হও, কর্ত্তব্যে দৃঢ় হও, কর্ত্তব্যের পূজা কর, তোমার জীবন অনির্ব্বাণ হোমশিখার মতন পবিত্র ও উজ্জ্বল হবে। 'জীবনের কোনও মহৎ লক্ষ্যকে কখনও অবমাননা করব না,' এই সঙ্কল্প প্রাণে নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হও, কর্ম্মক্ষেত্র তোমার জন্ত ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হবে। সর্ব্বোপরি, জীবনপথে চলতে চলতে প্রেম যত আকারে হৃদয়ে উদিত হয়, যত প্রীতি যত ভক্তি যত স্নেহের বন্ধনে

মানুষের সঙ্গে হৃদয় আবদ্ধ হয়, সে-সকলকে জীবনে প্রভুত্ব করতে, জীবনকে শাসন করতে গঠন করতে দাও,—তোমার সেই কোমল কমনীয় প্রাণ প্রেমময়ের নিত্য লীলাভূমি হবে; জীবন মধুময় হবে, ধন্য হবে।

জীবনই ব্রহ্মযোগসাধনের ক্ষেত্র। জীবনের অপব্যবহার করো না, জীবনের কোনও কার্য্যে ঈশ্বরবিহীন হয়ো না, জীবনের কোনও অবস্থায় ধর্ম্মহীন থেকো না। জীবন বাঁচাও, জীবন বাড়াও, জীবন বিকাশ কর, জীবনই ঈশ্বরের মন্দির। তাঁর জন্য গৃহী হও, কর্ম্ম কর; তাঁর জন্য শিল্পী হও, কবি হও, তাঁর জন্য প্রেমিক হও, প্রেম চাও, প্রেম দাও। তাঁর জন্য দেশ-সেবক হও, সাহিত্যিক হও, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর। তাঁর জন্য সুন্দর হও, গৃহ সুন্দর কর, পরিজনকে সুন্দর কর ও সুন্দর দেখ, সাজ ও সাজাও। তাঁর জন্য আনন্দ-হৃদয় নিয়ে, মুখের প্রফুল্লতা নিয়ে, আকাশে ব্যাপ্ত তাঁর ঐ আনন্দকে বাড়াও— তাঁরই জন্য শোক-দুঃখের তীব্র বজ্রের কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে হৃদয় পেতে দাও। তাঁরই জন্য স্নেহ দয়া ভক্তিতে কোমল হও, তাঁরই জন্য কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ় কঠোর হও। তাঁরই জন্য উচ্চ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ও প্রগল্‌ভ হও, তাঁরই জন্য ধীর সহিষ্ণু ও নম্র হও। তিনি তোমাদের দেহের সৌন্দর্য্য দেখে সুখী হোন, তোমাদের মনের সৌন্দর্য্য দেখে সুখী হোন, তোমাদের ললাটে প্রতিভা ও মহত্ত্বের জ্যোতি দেখে সুখী হোন; তিনি পরিবারের মধ্যে তোমাদের প্রেমিক রূপে দেখে সুখী হোন, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর ভৃত্যের সাজে দেখে সুখী হোন। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন ধর্ম্মময় হয়ে ধর্ম্মের সুন্দর ও মহৎ আদর্শ জগতের কাছে প্রচার করুক।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৩

যৌবন ও ধর্ম্ম

ধর্ম্মসমাজে তার যুবকমণ্ডলীর বিশেষ একটি স্থান আছে। ধর্ম্মমণ্ডলীর জীবনকে সরস রাখবার ও সম্পূর্ণ করবার জন্য এমন কতকগুলি ভাবের সাধনা করা দরকার, যৌবনই যার পক্ষে উপযুক্ত কাল।

বাল্যের অবসানে যৌবন যেন এক নূতন জীবনের মত আসে। তখন দৃষ্টি নূতন, চিন্তা নূতন, আশা আকাঙ্ক্ষা নূতন হয়। মানুষের জীবনে বিধাতার হাতের যে সৃষ্টিকার্য্য, তার একটা পর্য্যায় যেন শেষ হয়ে যায়।

শৈশবে তিনি মুখের দিকে এক ভাবে চেয়েছিলেন, যৌবনে তিনি আর এক ভাবে চান। "আমার যা কিছু দেবার ছিল, তোমাকে এক বারের মতন সব দেওয়া হ'য়ে গেছে। এখন তুমি আমাকে কি দেবে তা ভেবে দেখ,"—এই ভাবে তিনি যৌবনের দিকে চান।

যৌবনটা বরণের সময়, নির্ব্বাচনের সময়; জীবনের সব নির্ব্বাচনে,—বন্ধু নির্ব্বাচনে, সঙ্গী নির্ব্বাচনে, অর্থাগমের উপায় নির্ব্বাচনে, দেহ মনের জন্য সুখ-সুবিধা চিন্তা-কাজ ভাব-প্রভাবের যে আবেষ্টন রচনা করার প্রয়োজন হয় তার নির্ব্বাচনে। যৌবনে বিধাতার ডাক মানব-অন্তরে একটি বিশেষ আকার ধারণ করে আসে। তিনি যে আমাদের চান, এ কথা জীবনে বিশেষ ক'রে বুঝবার প্রথম মুহূর্ত্ত আসে আমাদের যৌবনে। শরীরের দিক থেকে নূতন একটি জীবন পাওয়া কত বড় অধিকার! কিন্তু আত্মার নবজীবন, আত্মার দ্বিজত্ব আরও কত বড় অধিকার! ব্রহ্মগত জীবন, পবিত্রতায় প্রেমভক্তিতে অভিষিক্ত জীবন লাভ করা আরও কত মহান্ অধিকার!

ধর্মসমাজের জীবনে যৌবনের কি কি দেবার আছে? অনেক দেবার আছে। ধর্মজীবনে গাঢ় ধর্মবন্ধুতা, মহৎ ভাবের সহজ উদ্দীপনা, ও উদ্যমশীলতার প্রয়োজন যেমন, তেমনি আনন্দ প্রেম ও বলের বড়ই প্রয়োজন। আনন্দ প্রেম ও বল,—এ সকলের উন্নত আকার কিরূপ, এ সকলের নির্ম্মল উৎস কোথায়, এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক্।

প্রথম কথা, আনন্দ। মানবজীবনের দেবতা, জীবনের ও জগতের স্বাদ গ্রহণের শক্তিকে যৌবনে সতেজ করে তোলেন। তাই, জীবনটা যে মিষ্ট, জগৎটা যে মিষ্ট, এই অনুভবটি যৌবনে সহজে মানব-অন্তরে উদিত হয়। এই অনুভবটি ধর্মজীবনের অতি মূল্যবান্ ধন। একজন আমেরিকান ধর্মযাজক লিখেছেন, জগৎকে ও জীবনকে তিক্ত বিরস বিষাদময় বলে বর্ণনা করলে ভগবানের স্বরূপের বিরুদ্ধে অতি গুরুতর libel-এর অপরাধ করা হয়; আর এ রকম কথা বললে মানুষকে ধর্ম্ম হ'তে যত অধিক বিমুখ করে দেওয়া হয়, এমনি আর কিছুতে হয় না। এটা খুব সত্য কথা। আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্মসাধনে কৃতজ্ঞতার ভাবটি কিয়ৎপরিমাণে দুর্ব্বল ছিল। ঈশ্বরের সাধারণ দানসকলের মধ্যে তাঁর করুণা অনুভব ক'রে সর্ব্বদা আনন্দে পূর্ণ হয়ে হাসিমুখে জীবন যাপন করবার আদর্শটি এ দেশের প্রাচীন সাধনায় বড়ই অস্পষ্ট ছিল। জীবনদাতার বিধিতে মানবজীবনে দুঃখ বিপদ মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু তবু বিশ্বাসীজন কখনও এ কথা ভোলেন না যে, প্রতিদিনের আলোতে বাতাসে, অন্নে জলে, মানুষের সেবায় সাহায্যে, জীবনদাতা তাঁর অজস্র দয়া মানবজীবনে ঢেলে দিচ্ছেন। সেই দয়া স্মরণে রেখে বিশ্বাসীজন হাসিমুখে জীবন যাপন করেন।

জীবনদাতা জীবনে যত আনন্দ ঢেলে দেন, মানুষ তা দুই ভাবে গ্রহণ করে। কেহ গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ হয়ে, নত হয়ে; কেহ গ্রহণ

করে লোলুপ হয়ে লালসার সঙ্গে। এক জনের মন বলে, "আঃ, কি আনন্দ তুমি দিলে! যা স্মরণ করে জীবনের কষ্ট ও সংগ্রামের দিনেও আনন্দে পথ চলব, এমন বস্তু পেলাম।" আর এক জনের মন বলে, "বাঃ, এ তো বেশ সুখ! জীবন থেকে এ রকম সুখ আরও আদায় করে নিতে হবে। আর, এ সুখের যাতে কেহ অংশীদার না হয়, এ সুখ যাতে কখনও হারাতে না হয়, প্রাণপণে তার চেষ্টা করতে হবে।" যৌবনকালেই সুখসকলকে প্রথমোক্ত ভাবে গ্রহণ করতে যে শিক্ষা করে, তার জীবনের পরিণতি হয় বিশ্বাসীর হাসিমুখে। আর লালসার ভাবে সুখকে যে গ্রহণ করে, তার জীবন মাধ্যাকর্ষণে চালিত বস্তুর মত প্রতিদিন খর ও খরতর বেগে অধোমুখে ধাবিত হতে থাকে।

যৌবনেই আনন্দের জীবন হতে লালসার বাণীকে সযত্নে দূরে রাখতে হয়। আজকাল অনেক মানুষ মানুষকে এই কথা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছে যে, "প্রবৃত্তির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দাও; যা কিছু সুখকর তা-ই করে যাও; সুখ ভিন্ন কার্য্যের নিয়ামক আর কিছু নাই; যা সহজ আনন্দের পথ, তা-ই মানুষের একমাত্র পথ।" প্রাচীন ধর্ম্মসকল অনেক সময়ে মানুষকে অহেতুক ও অযৌক্তিক নিবৃত্তির শিক্ষা দিতেন; এরা একেবারে তার বিপরীত কোটিতে গিয়ে অবাধ প্রবৃত্তির পথ দেখায়। যৌবনে প্রবৃত্তিসকল সতেজ হয় বলে মানবের প্রকৃতি-নিহিত গূঢ় সুখাসক্তি এই বয়সে মানুষের অন্তরকে ঐ কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। কত সময়ে লঘুচেতা বন্ধু ও সঙ্গীদের আলাপ ও ইঙ্গিত হ'তে এবং আমোদ প্রমোদ পরিবেশন যাদের ব্যবসায় তাদের প্ররোচনাময় উক্তি হতে এ ভাব যৌবনে মানুষের মনে সহজে প্রবেশ করে। এই প্রবৃত্তির পথ যে সত্য আনন্দের পথ নয়, এ যে পাপের পথ, এ বিষয়ে বেশী কিছু বলবার আবশ্যকতা নাই। কেবল একটি কথা

বলি। এ পথ পাপের পথ, শুধু এ কথাই যে সত্য, তা নয় ; পাপের ইহাই একমাত্র পথ। অবিচারে সুখের অন্বেষণ হতেই মানুষের সকল পাপের জন্ম। জীবনে যদি কোনও সময়ে যাহা প্রেয় ও যাহা শ্রেয়, যাহা সুখকর ও যাহা কল্যাণকর, এই উভয়ের পার্থক্য মনে রাখবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে যৌবনই সেই সময়। যৌবনের যে-আনন্দ সারা জীবনকে সার্থক করে ও ধর্ম্মজীবনকে পুষ্ট করে তার পথটি এ দিকে নয়।

আর এক প্রকার কৃত্রিম প্রফুল্লতা ও স্ফূর্ত্তির আদর্শ হতে আজকালকার দিনে সাবধান থাকা দরকার হয়েছে। সে আদর্শ এই কথা বলে যে, জীবনটা একটা সুদীর্ঘ পরিহাসের (joke) ব্যাপার মাত্র ; অতএব, কোনও ব্যাপারকে বেশী গভীর ভাবে (seriously) গ্রহণ করো না ; কোনও বিষয় নিয়ে মনটাকে উচ্ছ্বসিত বা কাতর হতে দিও না, কখনও চোখের জল ফেলো না, ভালবাসা কি ভক্তিতে আকুল হয়ো না ; মনের চামড়া পুরু কর ; সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জন্ম মরণ, স্নেহ প্রেম, সকলকেই হাসির বিষয় বলে মনে কর। বিগত প্রথম যুদ্ধের সময় এ ভাবের চূড়ান্ত দেখা গিয়েছিল। পরিখায় (trench-এ) যুবা সৈনিকেরা দিবানিশি মৃত্যুতে বেষ্টিত থেকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হতে চাইত না। হাসি তামাসা করে, হাসির ছবি এঁকে, হাসির বই পড়ে, হাসির গান গেয়ে, হাসির কাগজ ছাপিয়ে কাল কাটাত। তাদের মনের ভাবটা যেন এই ছিল যে, শুধু জীবনটাই যে একটা great joke তা নয়, মৃত্যুও একটা great joke মাত্র। এ আদর্শের বিষয়ে আর কি বলব ? মানবজীবনে দুঃখ বিপদ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করতে হয় বটে ; কিন্তু এ ভাবে অগ্রাহ্য করাতে বীরত্ব নাই, মনুষ্যত্ব নাই। এমন কি পশুত্ব হতেও যেন এ আদর্শ নীচু। এ আদর্শ মানুষকে একটা

বিকট কদর্য্য হাস্তময় জড়পদার্থে পরিণত করে মাত্র। ভগবান মানুষের জীবনে দুঃখ বিপদ মরণ রেখেছেন কেন? আমরা উন্নত হৃদয়ের দ্বারা সে সকলের উর্দ্ধে উঠব বলে; নিরেট পাথরের মতন হয়ে গিয়ে সে সকল অগ্রাহ্য করব বলে নয়। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এই অবিরাম ফক্কুরী ও নিরেট পাথর হওয়ার আদর্শটিও আজকাল এক শ্রেণীর তরুণবয়স্ক মানুষের চিত্তে স্থান লাভ করছে।

আনন্দের এ সকল অসত্য পথের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আমরা সত্য আনন্দের কথা আবার ভাবি। যৌবনে সত্য আনন্দের দুটি নূতন পথ মানুষের জীবনে খুলে যায়। প্রথম পথ, নববিকশিত শক্তিসকলের ব্যবহারের পথ; দ্বিতীয় পথ, হৃদয়ের পথ। যৌবন বিশেষ ভাবে শক্তি সকলের চালনার সময়। এ সময়ে মানবের মস্তিষ্ক জ্ঞান আহরণের ও নূতন উদ্ভাবনের প্রয়াসে আনন্দ পায়; প্রতিভা, শিল্প, সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দ পায়; সবল বাহু পরিশ্রম করে আনন্দ পায়; সমগ্র প্রকৃতি দায়িত্বপূর্ণ ভার পাবার জন্য ও বহন করবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে; জীবন যেন আর লক্ষ্যহীন হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে চায় না। জীবনদাতারই এই নিয়ম; তিনি নিজে স্রষ্টা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি স্রষ্টার ভাব নিহিত রেখেছেন। সৃষ্টিতে আমরা আনন্দ পাই।

সৃষ্টির আনন্দের উর্দ্ধে হৃদয়ের আনন্দ, হৃদয়ের অন্তভূত সম্বন্ধের আনন্দ। সৃষ্টির জীবনে মানুষ একাকী। স্রষ্টা নিজের ভিতরে নিজের শক্তিকে অনুভব করে; সে নিজেকে দেখে ও সম্মুখে বিস্তৃত নিজের সেই কার্য্যক্ষেত্রকে দেখে, যেখানে ধীরে ধীরে তার সৃষ্টি গড়ে উঠবে। ইহা ভিন্ন আর কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই। আনন্দের যে দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ হৃদয়ের পথ, তা অন্তরূপ। সে-পথে মানুষ শুধু

আপনাকে দেখে না; আরও এক জনকে দেখে, যার জন্ত সে খেটে সুখী, যার জন্ত সে স্রষ্টা হয়ে সুখী; যার জন্ত কখনও সে কিছু করে সুখী, কখনও বা কিছু করতে বিরত হয়ে, আপনার প্রবল ইচ্ছাকে থামিয়ে সুখী। যৌবনের শক্তিচালনার জীবন যখন হৃদয়ের জীবনের অধীন হয়ে যায়, তখন তা কি সুন্দর হয়! যে যুবকের জ্ঞানানুশীলন পূর্ব্বে কেবল বুদ্ধির ব্যায়ামের মত ছিল, কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে করে, প্রতিপক্ষের যুক্তিকে বিধ্বস্ত করে করে যে যুবক পূর্ব্বে শুধু বিজয়ী মল্লের মত একটা গর্ব্ব অনুভব করতো, তার সেই জ্ঞান-অনুশীলনের সঙ্গে একবার বিমল গুরুভক্তি যুক্ত হয়ে যাক, অমনি তার সে-আনন্দ কত উন্নত কত গভীর হয়ে যাবে। শিষ্য ভক্তিমান হলে তার চিত্তের একাগ্রতা, তার মনন-শক্তি, তার দুর্গম বিষয়কে বিদ্ধ করবার বুদ্ধি, গুরুর সান্নিধ্যে যেরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, একাকী অধ্যয়নে তা কখনও হয় না। আনন্দের তো কথাই নাই। এক একটি প্রশ্নের সমাধান হলে 'আমি এতদিনে কৃতকার্য্য হলাম,' এই আনন্দের সঙ্গে পবিত্রতর আর একটি আনন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়; তা এই যে, 'তুমি আমাকে যা বুঝাবার জন্ত এত ব্যাকুল ছিলে, আমি এতক্ষণে তা বুঝলাম, তোমাকে তৃপ্তি দিলাম; অতঃপর আমার এই নূতন অর্জ্জিত জ্ঞানটুকুর মধ্যে দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার আনন্দময় যোগ কত বাড়বে!

শক্তিচালনার পথ ও হৃদয়ের পথ,—আনন্দের এই দুই পথই যৌবনে মানুষের জীবনে যুগপৎ খুলে যায়। বিধাতার এ কি অপূর্ব্ব বিধি! তাই দেখতে পাই, যৌবনে মানুষ কেবল যে কিছু অর্জ্জন ক'রে, কিছু সৃষ্টি ক'রে, কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ক'রে আনন্দ পায় তা নয়। আর এক জন আমাকে দেখছেন বলে যে উন্নততর আনন্দ, তা-ও এই সময়েই জীবনে ফুটে ওঠে। শরীরী হোন, আর অশরীরী হোন, আর

এক জনকে মনে ক'রে জীবন যাপন করা, আর এক জনের তৃপ্তির জন্য উৎসাহে ও উদ্যমে জীবনের সকল পরিশ্রমে ও প্রয়াসে নিযুক্ত হওয়া, এ শিক্ষাও যৌবনেই মানুষের জীবনে বিশেষ করে আসে।

লোকে বলে, যৌবন আশা করবার কাল। কথায় বলে, "যুবকের বুক ভরা আশা।" এই আশাশীলতার বিষয়েও ঐ কথা খাটে। শক্তির অনুভব হতে উত্থিত আশা ও হৃদয় হতে উত্থিত আশা, এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। "আমি জগতে কিছু করব, আমার নাম রাখব, জগৎ আমার কাজ দেখবে, আমায় মনে রাখবে, এ প্রকার আশাতে 'আমি' প্রধান, জগৎ ছোট। কিন্তু "আর এক জন প্রেম ভক্তির আস্পদ আমার সকল প্রয়াস দেখবেন, দেখে তৃপ্ত হবেন," এ আশাতে 'আমি' ছোট, তিনি বড়। কে বলে যে যৌবনে শক্তির সুরা দিয়ে 'আমি'কে বড় করে তোলে? বিধাতার অভিপ্রায় কখনও তা নয়! তাঁর অপূর্ব্ব নিয়মে সেই যৌবনই আবার হৃদয়কে সরস করে আমিত্বকে লুপ্ত করতেও শেখায়। যৌবনই আত্মহারা হয়ে ভালবাসবার সময়; যৌবনই শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে মানুষকে ভক্তি করবার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার সময়; ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যে, যৌবনই ভগবদ্‌ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত জীবন লাভ করবার সময়।

যৌবন আনন্দের কাল বটে, কিন্তু পবিত্র ও উন্নত আনন্দের উৎস কোথায়? যা কিছু সুখকর তার অনুসরণে নয়, জীবনকে পরিহাস বলে গ্রহণ করে নয়, কেবল শক্তির চালনাতেও নয়। সে উৎস মানবের সেই হৃদয়ে, যে হৃদয় হ'তে উৎসারিত নির্ম্মল কৃতজ্ঞতা, নির্ম্মল প্রেম, নির্ম্মল ভগবদ্‌ভক্তি, সকলেরই সাধারণ লক্ষণ আপনাকে নত করান, আপনাকে ভুলে যাওয়া, আপনাকে সমর্পণ করা।

আনন্দের কথা বলতে বলতেই আমার দ্বিতীয় কথায় অর্থাৎ প্রেমের

কথায় এসে পৌঁছেছি। যৌবন প্রেমের বিকাশ-কাল। যা সমগ্র জীবনকে মধুময় করবে, জগৎকে মানুষকে ঈশ্বরকে যাতে প্রিয় করে দেবে, আমাদের যাতে স্নেহময় ভ্রাতা ভগিনী, প্রেমিক পতি পত্নী ও পিতা মাতা হতে শেখাবে, যা আমাদের ধর্ম্মগুরু ও নেতাদের প্রতি ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবতী হতে, ঈশ্বরে ভক্তিমান ভক্তিমতী হতে শেখাবে, হৃদয়ের সেই বিকাশের মূল্য কত! জীবনে এই প্রেমধনের মূল্য কত! ইহার মূল্য কত যে অধিক, তা যখনই চিন্তা করি, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করি যে, হৃদয়ে প্রেমধারার উৎসটি যৌবনে যখন প্রথম খুলতে থাকে, তখন তাকে বিমল রাখার গুরুত্ব কত! তরুণদের জীবনে প্রেম এত সহজ ও স্বাভাবিক বলেই হয়তো তাঁরা বুঝতে পারে না যে, প্রেমের উৎসমুখ যাতে কলুষিত হতে না পারে তার জন্য দায়িত্ব মানব-জীবনে কত গভীর।

প্রেম সম্বন্ধে দু-একটি এমন কথা মাত্র আমি বলবো যৌবনের সঙ্গে যার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রেমের অনেক কাজ। বাইরের যে প্রয়োজনের রাজ্যে মানুষের জীবন প্রসারিত, মানুষ যে সুখ-দুঃখ অবস্থা-ঘটনার রাজ্যে জীবনধারণ করে, সেখানে প্রেমের কাজ,—সেবা করা। আবার অন্তররাজ্যে প্রেমের কাজ,—সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া; আনন্দকে উজ্জ্বল ও বেদনাকে শীতল করে দেওয়া; আশা করা, আশা দেওয়া; ক্ষমা করা, বিশ্বাস করা; সহ্য করা, ভার বহন করা; নীচে থেকে টেনে উপরে তোলা, হাতখানি ধরে মঙ্গলের পথে স্থির রাখা। এ সকল কাজ ছাড়া অন্তররাজ্যে প্রেমের আরও একটি কাজ আছে; সেটি হচ্চে, মুগ্ধ করা। প্রেমের স্বভাবই এই যে, সে প্রেমাস্পদকে মুগ্ধ করতে চায়। যৌবনে প্রেমের এই লক্ষণটির দিকেই মানুষের মন স্বভাবতঃ বেশী ঝোঁকে।

মা কি সন্তানের শুধু সেবাই করেন? প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের শুধু অভাব পূরণই করেন? প্রেমের প্রধান দৃষ্টি কোন্ দিকে?—প্রেমাস্পদের অন্তরের দিকে। সেই অন্তরখানিকে মুগ্ধ ক'রে সে নিজের দিকে টেনে রাখতে চায়। সন্তানকে ভাল বেসে-বেসে মা যে তাকে মুগ্ধ করে ফেলতে চান, তার দৃষ্টান্ত আমরা ঘরে ঘরে রোজই দেখতে পাই। বড় হয়ে আমরা দেখি যে, মা আমাদের জন্য কি কি করেছিলেন, তা অনেক সময় স্মরণ করতে পারি না; কিন্তু মা যে কত মিষ্টি ছিলেন, তা কখনও ভুলি না। শুধু মায়ের ভালবাসা নয়, সব ভালবাসাতেই এ সত্য। যিনি বিশ্বের জননী, এ বিশ্ব যাঁর প্রেমের একখানি বিস্তীর্ণ জাল, তিনিও আমাদের মন হরণ করেন। ভক্ত কবি বলেছেন, "সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে!" এখানে 'মায়া' কথাটি বড়ই সত্য। এই তো যথার্থ মায়াবাদ! যে-অর্থে সত্যি সত্যিই এ বিশ্ব তাঁর মায়া, সে-অর্থ তো এখানেই প্রকাশিত; বেদান্তের মায়াবাদে সে তত্ত্বের কি বোঝা যায়? সেই প্রেমময় তাঁর প্রেমে আমাদের মন ভুলিয়ে দিচ্ছেন, চোখে মোহনমন্ত্র বুলিয়ে দিচ্ছেন। সসীম ও অসীম দুই প্রেমেরই কাজ,—মুগ্ধ করা।

কিন্তু প্রেমের এই যে মুগ্ধতা, এই যে charm, এরও উঁচু নীচু আকার আছে। এর পূর্ণতা কখন হয়? যখন এক জনের আত্মা আর এক জনের আত্মাকে চায় ও আপনাকে দিতে চায়, তখন হয়। আর নিকৃষ্ট মুগ্ধতা হয়, ভোগে ও রূপে। মা সন্তানকে যে খাবারটুকু দিলেন, সন্তান যদি তা খুব মুগ্ধ হয়ে খায়, খুব তাকিয়ে তাকিয়ে খায়, তাতে মার আনন্দ হয়। কিন্তু সন্তানের মুগ্ধতা যদি এর চেয়ে উর্দ্ধে কখনও না ওঠে, তবে কোনও গভীর একাকিত্বের সময়ে, নির্জ্জন চিন্তার সময়ে, হয় তো গভীর নিশীথে, মার বুক এই বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে ওঠে

যে, "আমার সন্তান এখনও আমার ভালবাসা বুঝল না, আমাকে ভালবাসতে শিখল না!" পতির দেওয়া গহনায় সাজ-পোষাকে যে-নারী মুগ্ধ, সেজে গুজে বাহির হওয়াতেই যার আনন্দ, তার পতির ক্ষুধিত অতৃপ্ত হৃদয় হয়তো কত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে যায়।

এই ভোগের মুগ্ধতা হতে উর্দ্ধে রূপের মুগ্ধতা; কিন্তু তা-ও শ্রেষ্ঠ মুগ্ধতা নয়। কত সময় এমন দেখা যায় যে কোনও রূপবতী নারীকে তার পতি তার রূপের জন্যই মনোনীত করেন; বিবাহিত জীবনে পতি দিবানিশি তার রূপেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত বার কত রকমে তার রূপের বর্ণনা করেন, কত আদরে ইঙ্গিতে জানতে দেন যে আমি তোমার ঐ রূপে মুগ্ধ। অসার প্রকৃতির নারী হলে তাতেই সে তৃপ্ত। কিন্তু সারবান প্রকৃতি যার, তার ভাবনা হয়, "আমার যখন রূপ থাকবে না তখন কি পতির এ মুগ্ধতা থাকবে?" সে-নারীর মন দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে ওঠে। প্রেমের জীবনে রূপের মুগ্ধতাও শেষ কথা নয়। প্রেম প্রশ্ন করে, "তুমি আমাকে চাও কি না? আমার জন্য কষ্ট সইতে, ভার বহন করতে, আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছ কি না?"

ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা। জগৎকে তাঁর দান বলে অনুভব ক'রে আমরা আনন্দে জগৎকে আস্বাদন করি এবং জগতের সৌন্দর্য্যকে তাঁরই রূপ বলে অনুভব করে মুগ্ধ হয়ে আমরা সেই সৌন্দর্য্য দেখি। এ উভয়ই তাঁর সত্য দর্শন, এতে সন্দেহ নাই। সত্যই তো তিনি রূপময়, তিনি পরম সুন্দর। যৌবনে সহজেই সেই প্রেম-সুন্দরের রূপ সেই হরি-সুন্দরের রূপ তাঁর জগতে দেখে ও তাঁর স্বরূপজ্যোতিতে দেখে মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এই রূপমুগ্ধতাই ধর্মজীবনের চরম কথা নয়, তাঁর প্রতি প্রেমের চরম কথা নয়। তিনি তো শুধু পরমসুন্দরই নন;

তিনি মানবাত্মার পরমাত্মা, পরম স্বামী, পরম প্রভু। শুধু তাঁর জগৎ-সৌন্দর্য্যে নয়, শুধু তাঁর স্বরূপ-সৌন্দর্য্যেও নয়, কিন্তু তাঁহাতে এমন মুগ্ধ হতে হবে যে তাঁর চরণে নিজকে একেবারে সঁপে দিতে পারি, তাঁর ইচ্ছাতে নিজ ইচ্ছা বিসর্জ্জন করতে পারি, তাঁর জন্য সব বইতে সব সইতে পারি ; সব বহন করে ও সব সহ্য করে আপনাকে কৃতার্থ বলে অনুভব করতে পারি। এই জন্যই তো তিনি মানবজীবনে সুখ-দুঃখ রোগ-স্বাস্থ্য জীবন-মরণ আলো-আঁধার রেখেছেন। ভগবৎ-প্রেম কি এ সকল থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু জগৎ-সৌন্দর্য্যের দিকে বা তাঁর স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের দিকেই চেয়ে থাকবে? তা কখনও নয়। সত্য প্রেম, পবিত্র প্রেম ফোটে কোন্ রাজ্যে? খেলে কোন্ রাজ্যে? আনাগোনা করে, কারবার করে কোন রাজ্যে? ভোগরাজ্যে নয়, রূপরাজ্যে নয়, সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্য ও সংগ্রামের রাজ্যে যেখানে মানবকে পরস্পরের জন্য ও পরমেশ্বরের জন্য বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হয়, সেই রাজ্যে।

এই জন্যই বলছিলাম, প্রথম জীবনে প্রেমের উৎস হতে যাতে উন্নততম শুদ্ধতম প্রেমধারা নিঃসৃত হয়, তরুণ-হৃদয়ে প্রেমের উৎস-মুখ যাতে কলুষিত না হয়, তার দিকে দৃষ্টি বড়ই গুরুতর প্রয়োজন। কিসে এ উৎসধারা কলুষিত হয়? এ উৎসধারা কলুষিত হয়ে গেলে অমূল্য মানবজীবনের অমূল্য বয়স যে যৌবন, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিসে এ মহা দুর্ভাগ্য ঘটে? ইন্দ্রিয়রাজ্যে অতি-বাস, ভোগরাজ্যে অতি-বাস, স্পর্শরাজ্যে অতি-বাস, রূপরাজ্যে অতি-বাস,—এ সকলই মানবজীবনের সব অবস্থায়, বিশেষতঃ যৌবনে, প্রেমের উৎসকে পঙ্কিল করে। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজেই কতবার এমন হয়েছে যে একটি তরুণ পুরুষ ও একটি তরুণী নারী অতি পবিত্র ও বলিষ্ঠ প্রেমে পরস্পরকে ভালবেসেছে। তারা পরস্পরের জন্য কত যে অপেক্ষা করেছে,

কত ত্যাগ কত সংযম কত ক্লেশ বহন করেছে, তা দেখে সকল বন্ধুজনের হৃদয়মন উন্নত হয়েছে। দম্পতি হয়ে তারা আজীবন সমাজমধ্যে এমন একটি উন্নত প্রেমের প্রস্রবণ প্রবাহিত রেখেছে যা দেখে মানুষের চিত্ত আপনি বলে উঠেছে, "ধন্য প্রেমময় বিধাতা, তুমি ধন্য!" কিন্তু অপর দিকে, যৌবনে যারা প্রণয়-সাহিত্যে অত্যধিক বিচরণ ক'রে ক'রে, হৃদয়ের প্রেমবস্তুতে কল্পনার জল ঢেলে ঢেলে তাকে আগে থেকেই জলো করে রাখে, সুখের ও রূপের লালসাতে যারা হৃদয়ের প্রেমের উৎসকে কলুষিত করে ফেলে; পশ্চিমের অনুকরণে প্রণয়ের হাবভাবের খেলা ক'রে ক'রে, বা চপলভাবে মেশামিশি করে করে যারা হৃদয়কে বিকৃত করে ফেলে,— তাদের দিকে চেয়ে মন বলে ওঠে, হায় কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য! যৌবনেই যদি মানবের হৃদয় গাঢ় ও গভীর প্রেমের অনুপযুক্ত হয়ে গেল, যা হতে সারা জীবনে ত্যাগ, শ্রম, ধৈর্য্য, পরস্পরের প্রতি গভীরতম আস্থা ও নির্ভর উৎপন্ন হবে, এমন সারবান প্রেমের অযোগ্য হয়ে গেল, তবে বলতে হয়, হায় হায়, এদের কি সর্ব্বনাশ হল! যে-অমৃত বিনা মানব-জীবন মরুসমান হয়, তাকে এরা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এল! হায় কি ক্ষতি! কি ক্ষতি!

যদি যৌবনের সরসতা ও সহজ-মুগ্ধতার সঙ্গে প্রেমের আত্মোৎসর্গের ভাবটি যুক্ত হয়, যদি যৌবনে হৃদয়ে উদ্গত প্রত্যেক প্রেমের উচ্ছ্বাস জীবনে নূতন পবিত্রতার মহত্ত্বের সংযমের ত্যাগের প্রেরণার সঞ্চার করতে পারে, যদি প্রাণটা বলে, "আঃ আমি এমন ভালবাসা পেয়েছি! তবে আমি এ প্রেমের যোগ্য হবার জন্য কত উন্নত হব! এ প্রেমের খাতিরে আমি কোন্ ভার আনন্দে না বহিব, কোন কষ্ট আনন্দে না সহিব"—যদি যৌবনে গৃহ-পরিবারের সকল প্রণয় ভক্তি ও স্নেহ প্রতিদিন সহস্র আত্মোৎসর্গে আত্ম-নতিতে আত্মসংযমে উজ্জ্বল হতে পারে, তবে

ধন্য সে-যৌবন! এমন যৌবন হতেই প্রেমের বীরত্বের জন্ম হয় যা মানবজীবনে মহত্তম বীরত্ব। এমন যৌবন হ'তেই প্রেমের সেই স্বর্গীয় মধুরতার জন্ম হয় যা প্রত্যেক উন্নতহৃদয় দম্পতি নিজ নিজ গৃহধর্ম্মে প্রতি মুহূর্ত্তে আস্বাদন করেন; অধিকাংশ উপন্যাসে বর্ণিত প্রণয়ের ব্যাপার যার হাজার হাত নীচের গর্ত্তের তলায় লুটায়। আর, এমন যৌবনই বিমল ভগবৎ-প্রেম, বিমল ভগবদ্ভক্তি লাভ করবার জন্য জীবনে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।

যৌবন বলিষ্ঠ হবার সময়। যৌবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহখানি বলের আধার; তাই পরিবারে ও সমাজে কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করবার সময় মানুষ যৌবনকে এত মূল্য দেয়। যৌবন আত্মার পক্ষেও বলিষ্ঠ হবার সময়; ধর্ম্ম-জগতে সেই বলের বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু মানবের অন্তর-রাজ্যেও যে 'বল' বা 'শক্তি' নামে অভিহিত হবার যোগ্য একটি বস্তু আছে, মানুষ তা অনেক সময় ভুলেই থাকে। বাইরের জগতেও মানুষের ভাষায় অনেক সময় এই ভুলের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ কথায় কথায় বলে, "বাণ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, কোদাল মাটি কাটে, কর্ণিকে বাড়ী গাঁথে।" মানুষ এখানে শুধু যন্ত্রটাকেই দেখে। কোদাল মাটি কাটে কেমন করে? শুধু তার ধার আছে বলে? তা কখনও নয়। একটা বাহু তাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করেছিল, তাতে বেগ (momentum) সঞ্চার করেছিল, তাই সে কাটে। হাতের ঐ বলটা পিছনে না থাকলে বাণ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে না; মাটির উপর এক হাজার কোদাল শুয়ে পড়ে থাকলেও তাতে এক চাপড়া মাটি ওঠে না; ইটের স্তূপের উপর এক হাজার কর্ণিক্ রেখে দিলেও তাতে গাঁথুনি এক ইঞ্চি অগ্রসর হয় না। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য একটা পেশী-বহুল বাহু চাই, আর বাহুর পেশীর মধ্য দিয়ে একটা শক্তিস্রোত (energy) সঞ্চালিত হওয়া

চাই। তেমনি, মানুষের মনকে জ্ঞান দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, সভ্যতা দিয়ে ধার দিলে কি হবে? তাতে কিছু কাটে না, কিছু গাঁথা হয় না। তা'তে একটি পাপ-অভ্যাস কাটে না, একটা কুচিন্তা দমন হয় না, একটা কাপুরুষতা দূর হয় না, চরিত্রের একখানি ইট গাঁথা হয় না, দেশের একটা কুরীতি দূর হয় না, একটা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রচনা হয় না। এ সকলের জন্য চাই সবল বাহু, চাই বল। আত্মার সে সবল বাহু কি? সে বল কি? ঈশ্বরে সমর্পিত ইচ্ছা, ব্রহ্ম-ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত ইচ্ছাই (will) আত্মার সেই মাংসল বাহু এবং ব্রহ্মের পুণ্য প্রভাবই তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শক্তিস্রোত, তাতে সঞ্চরমান energy. আত্মাতে এই বল নাই বলে আমাদের দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক, হাজার হাজার ধারাল কোদালের মত, বরপণ-প্রথার মাটির ঢিপির উপর শুয়ে পড়ে আছে; তাদের দ্বারা এক কোদাল মাটি উঠচে না, এ প্রথা দূর হবার পক্ষে সামান্য সাহায্যও হচ্ছে না। ব্যক্তিগত জীবনে তারা ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরূপ আচরণ করবার সাহস ও শক্তি পাচ্ছে না। আজকালকার কঠিন জীবনসংগ্রামে তারা সাধুতা ও সত্যপরায়ণতাকে রক্ষা করতে পারছে না। চাকরী চাইতে গিয়ে ঘুষ দিয়ে, বয়স সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে, ব্যবসাক্ষেত্রে নানা চাতুরী ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে তারা অন্তরাত্মাকে কলুষিত করে ফেলছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকলের মৌখিক সমর্থন করে বটে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল যুবক, যারা এখনও সংসারে পাকা হয়ে যায় নি, যারা শিক্ষার আলোক পেয়েছে, তারা অন্তরের অন্তরে এ সকল আচরণকে ঘৃণা করে; এবং যখন নিজেরা এ সকল অন্যায় পথ অবলম্বন করে তখন অন্তরে নিজেদের অপদার্থ ও ভীরু বলে জানে। মানুষ তো কখনও সাধ করে নিজ আত্মায় কালি মাখায় না! এরা পারছে না, এদের শক্তিতে কুলাচ্ছে না;

এদের বল নাই, বল নাই! জ্ঞানে এদের বল দিতে পারে নি; শিক্ষায় সভ্যতায় বল দিতে পারে নি। বল যে সেই এক জায়গায়! ব্রহ্ম-ইচ্ছায় সমর্পিত ইচ্ছাই (will) মানবাত্মার সবল বাহু; ব্রহ্মের শক্তিই তাতে সঞ্চরমাণ শক্তি। জ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা, এ সকল তো হাতের কোদাল কুড়াল মাত্র।

তরুণ ভাই বোন, ভারতের জন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন যে এরূপ বলশালী আত্মা, তা কি তোমরা বোঝ? তা কি তোমরা দেখতে পাও? তোমাদের চোখ কেমন, একবার দেখি? তোমাদের দৃষ্টি কত দূর যায়? তোমরা দেশের বড় বড় বক্তাদের, নেতাদের, কবিদের, শিল্পীদের দেখ? বড় বড় movement ও institution দেখ? আর কিছু কি দেখতে পাও না? অথবা, ঈশ্বরকে কি শুধু তোমরা সৌন্দর্য্য-রাজ্যে রূপরাজ্যে, যৌবনের ভাবরাজ্যে দেখেই শেষ কর? তাঁকে কি শুধু যৌবনের আবেগ ও সরসতার মধ্যেই দেখ? শুধু অন্তরের প্রবল প্রবাহসকলের মধ্যেই দেখ? তাঁকে কি এমন পুরুষ রূপে এখনও দেখ নাই, যিনি তোমাদের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, পূর্ণ ইচ্ছা-সমর্পণ, জীবনের সকল আবেগে সকল কামনায় সকল পরামর্শে ও মীমাংসায় পূর্ণ অধীনতা দাবী করছেন? সেই 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ,' যিনি তোমাদের প্রত্যিজনের প্রভু, তাঁর সঙ্গে কি তোমাদের চোখাচোখি এখনও হয় নি? এ ভাবে তাঁকে এখনও না দেখে থাকলে শীঘ্র সে দর্শনের জন্ত তোমাদের যৌবনকে প্রস্তুত কর। দেখবে, তাঁর হাতে সমর্পিত ইচ্ছাই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয় জগতে প্রবলতম শক্তি। দেখবে, পৃথিবীতে মানবের ইতিহাস-গঠনে, মহৎ লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত জীবনই প্রবলতম শক্তি। আত্মার এই বলের সাধনা, ব্রহ্ম-ইচ্ছায় সমর্পিত ইচ্ছার সাধনা যৌবনেই হয়। যৌবনই নির্ব্বাচনের বয়স। যদি

তাঁকে জীবনের প্রভু বলে নির্ব্বাচন করতে চাও, যদি তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে চাও, যদি বলশালী আত্মা হতে চাও, তা হলে এখনই তার সময়। আনন্দকে পবিত্র করে, প্রেমকে উন্নত করে, আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পিত ইচ্ছা দ্বারা বলশালী করে, তোমরা তোমাদের যৌবনকে ও জীবনকে সার্থক কর, দেশের ধর্ম্মজীবনকে শক্তিশালী কর।

৬ই মাঘ, ১৩৩০

তরুণদিগের প্রতি

যৌবনের বাসনাস্রোত

যাঁরা তরুণবয়স্ক, শরীরধর্ম্মবশেই তাঁদের সেই বয়সে মনে নানা বাসনা কামনার উদয় হতে আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক সুস্থ-হৃদয় তরুণের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, এ সকল বাসনা কামনাকে আমি কি চক্ষে দেখব? এদের প্রতি আমার মনের ভাবটি কিরূপ হওয়া উচিত?

ধর্ম্মপ্রাণ পিতামাতা ব্যাকুল প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে আশা করেন ও প্রতীক্ষা করেন যে, তাঁদের পুত্রকন্যাগণ কৈশোরের খেলাধূলার সময়ে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দর ছিল, একদিন সেই বাল্যলীলা সমাপ্ত করে তেমনি নির্ম্মল ও সুন্দর ভাবে তারা যৌবনে প্রবেশ করবে। পিতামাতার হৃদয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের জন্য যে ব্যাকুল মঙ্গলকামনা জাগে, ধার্ম্মিক মার্কিন কবি লংফেলো (Longfellow) তা একটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির নাম "কুমারী-জীবন" (Maidenhood)। তাতে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণা একটি কুমারী কন্যাকে তিনি পরম স্নেহভরে a smile of God অর্থাৎ ঈশ্বরের একটি নির্ম্মল হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর এই কবিতাটি পৃথিবীর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ পিতা মাতার হৃদয় মুগ্ধ করেছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত করেছে। কবির কয়েকটি উক্তি এইরূপ,—

Maiden, with the meek brown eyes,
In whose orbs a shadow lies,

Like the dusk in evening skies,—* *
Standing with reluctant feet,
Where the brook and river meet,
Womanhood, and childhood fleet!
Gazing, with a timid glance,
On the brooklet's swift advance,
On the river's broad expanse! * *
O thou child of many prayers!
Life hath quicksands, Life hath snares!
Care and age come unawares!

"হে কুমারি, তোমাকে দেখিয়া মনে হয়, তোমার চক্ষে যেন কি ভবিষ্যৎ ভাবনার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তোমার বালিকা-জীবনের ক্ষীণ স্রোতস্বতীটি যেখানে নারীজীবনের বেগবতী নদীর সহিত মিলিত হইবে, সেই বয়ঃসন্ধিস্থলের সম্মুখে আসিয়া তোমার চরণ যেন অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। তুমি চকিতনেত্রে দেখিতেছ, শৈশবের ক্ষীণ স্রোতস্বতী কত দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং সম্মুখে যৌবনের যে বেগবতী নদী, তাহা কত বিশালকায়া! হে স্নেহের কন্যা, হে বহু প্রার্থনার ধন! তুমি মনে রাখিও, জীবনস্রোতের মধ্যে অনেক ভয়ানক চোরাবালি প্রচ্ছন্ন থাকে, মানবজীবনে ইতস্ততঃ অনেক ফাঁদ পাতা থাকে! মনে রাখিও, অশান্তি ও সংগ্রাম অতর্কিত ভাবে জীবনে আসে; মনে রাখিও, অলক্ষিত ভাবে যৌবন চলিয়া যায়, জরা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কবি এখানে একটি কুমারী কন্যার সম্বন্ধে যা বলেছেন, সব ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধেই তা সত্য। যৌবন মানবজীবনে নানা প্রখর স্রোত ও প্রবল তরঙ্গ নিয়ে আসে, এবং সে স্রোতের বেগ, সে তরঙ্গের প্রবলতা প্রত্যেক সুস্থহৃদয় যৌবনপ্রাপ্ত মানুষের মনকে নিশ্চয়ই চিন্তাকুল করে।

কিন্তু এই সুন্দর কবিতাটি পড়তে পড়তে এ কথা মনে করে অন্তরে গভীর খেদের উদয় হয় যে, আজকাল কয়টি ছেলে মেয়েকে "বহু প্রার্থনার ধন" (child of many prayers) বলে সম্বোধন করা যেতে পারে? আজকাল কয়জন তরুণ তরুণীর এমন সৌভাগ্য যে, তাদের জীবনগুলি পিতামাতার ও অভিভাবকের হৃদয় হতে উত্থিত অসংখ্য ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা নিরন্তর বেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হয়? কয়জন তরুণ তরুণীর মনই বা কবি-বর্ণিতা কুমারীর ন্যায় যৌবনের আরম্ভকাল হতে অন্তরের নূতন বাসনাস্রোত সম্বন্ধে সজাগ, সতর্ক, সাবধান অবস্থায় থাকে?

ধর্ম্মের পরামর্শ

"যৌবনের সতেজ বাসনা কামনা সকলকে আমি কি চক্ষে দেখব?" এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্ম বলেন, "এদের উপরে নিত্য সতর্ক দৃষ্টি রাখ; এদের শাসন কর, ও স্বায়ত্ত করে রাখ, যেন উহারা অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটে সর্ব্বদা মাথা নত করে থাকে। পরাজিত ও বশীভূত হলে, ধর্ম্ম-বুদ্ধির অধীন হলে, উহারা তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হবে এবং একদিন হয়তো তোমার মিত্রেও পরিণত হবে। কিন্তু যদি প্রথম হতেই উহাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও শাসনের ভাব না রাখ, তবে ক্রমে উহারা তোমাকে পরাভূত করবে এবং তোমার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

আজকাল এক শ্রেণীর লোক তরুণদিগকে বলছেন, "এই সতর্কতার কোন প্রয়োজন নাই। প্রবৃত্তিসকলকে অন্তরে স্বচ্ছন্দে জাগতে ও খেলতে দাও। উহাদের সঙ্গে প্রথম হতেই বন্ধুতা কর, জীবনে সুখের অনেক দ্বার খুলে যাবে। ধর্ম্মের পরামর্শটি কঠোর, সুখহীন, শুষ্ক; তা শুন না।" এই শ্রেণীর পরামর্শদাতাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তরুণগণ তাঁদের কাছ হতে প্রতিদিন যে ইঙ্গিত, যে

প্রভাব, যে পরামর্শ প্রাপ্ত হচ্ছেন, তা অনুভব করে আমাদের মন দুঃখে ও আশঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে। তরুণগণ, ধর্ম্মের পরামর্শ গ্রহণ করবে, না, এই নূতন পরামর্শদাতাগণের পরামর্শ গ্রহণ করবে!

রিপু

প্রাচীনকালের ধর্ম্মসাহিত্যে মানব-মনের বাসনা কামনা সকলকে, বিশেষতঃ শরীরজাত প্রবৃত্তিকুলকে 'রিপু' নামে অভিহিত করা হতো। 'রিপু' শব্দের অর্থ শত্রু। প্রবৃত্তিকুলের সম্বন্ধে মানুষের মনে প্রথম হতেই একটি সজাগ সতর্ক ভাব উদয় করে দেবার অভিপ্রায় ছিল বলে প্রাচীনগণ এই নামটি ব্যবহার করতেন। যে মানুষটি ঘোর অনিষ্টকারী, যার সঙ্গ ও প্রভাব একান্তই পরিত্যাজ্য, যে মানুষ হাজার সৌজন্য প্রকাশ করলেও অথবা মিষ্ট কথা বললেও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা কর্ত্তব্য নয়, এমন মানুষকেই সংসারে 'শত্রু' বলা হয়। রূপক আশ্রয় করে প্রবৃত্তি-সকলকে এই অর্থেই 'রিপু' বলা হত।

'রিপু' শব্দের এই ব্যবহারের ভিতরে যে রূপকটি নিহিত আছে, একটি তুলনামূলক কাহিনীর দ্বারা তাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখা যাক্। এক স্থানে একটি ভদ্র সচ্চরিত্র যুবক ছিল। একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটি নূতন মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও আলাপ হল। সে মানুষটি খুব মিশুক ও আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন। যে দলে সে তুমও গিয়ে বসে, হাসিতে কৌতুকে আমোদে গল্পে গানে সে-দলের সকলকে সে একেবারে মাতিয়ে রাখে। কিন্তু যুবকটি ক্রমশঃ লক্ষ্য করতে লাগল যে ঐ লোকটির মনের গতি নিম্নমুখীন ও তার রুচি-প্রকৃতি অপকৃষ্ট। সে নিকৃষ্ট আমোদ আহ্লাদই ভালবাসে। তার সঙ্গে যুবকটির নানা ক্ষেত্রে বারবার সাক্ষাৎ হওয়াতে অবশেষে যুবকটি তার নমস্কার গ্রহণ করতে ও তাকে প্রতি-

নমস্কার করতে লাগল। এই ভাবে পরিচয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে যুবকের মনটা কিঞ্চিৎ অসুখী হল বটে, কিন্তু মনে জোর করে তার সঙ্গ বর্জ্জনের জন্য সে কোনও উদ্যোগ করল না। ক্রমে সেই লোকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় আচরণ করতে লাগল। যুবকটির সঙ্গে হেসে কথা কয়, পথে দেখা হলে রাজপথ পার হয়ে ছুটে নিকটে আসে। তখনও যুবকের অন্তরে এই দ্বিধা আসতে লাগল যে, ঐরূপ একটি লোকের সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা করা কি ভাল হচ্ছে? কিন্তু তখনও সে উহা নিবারণের কোন উদ্যোগ করল না। ক্রমে সে লোকটি ঐ যুবকের খেলার স্থানে দৈনিক সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল; তার সঙ্গে সঙ্গে নানা আমোদের স্থলে যেতে লাগল। তখন যুবকের মনের সতর্কতার বাঁধ একেবারে শিথিল হয়ে গেল। তখন হতে সেই মানুষটিই যুবকের প্রধান পরামর্শদাতা, এবং তার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবসম্পন্ন বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে সে আপনার সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অধঃপাতের পথে নিয়ে গেল।

প্রবৃত্তির প্রথম উদয়েই সতর্ক হও

যদি প্রশ্ন করা যায় যে সেই লোকটি ঐ যুবকের জীবনে সর্ব্বনাশকারী শত্রুরূপে অভ্যুদয় লাভ করতে পারল কেন? তবে তার উত্তর এই যে, প্রথম হতেই যুবকটি তার সম্বন্ধে মনের ভাবটি ঠিক করে নেয় নি বলে; প্রথম হতেই সজাগ, সতর্ক, সাবধান হয়ে তাকে বর্জ্জন করে নি বলে। সংসারে এরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমাদের যে কখনও সাক্ষাৎ হবে না, ইহা অসম্ভব। হয়তো কার্য্যসূত্রে এরূপ মানুষের সঙ্গে স্বয়ং গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করবার ও কথা বলবার প্রয়োজনও উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান মানুষ প্রথম থেকেই মনকে বেঁধে নেয়। সে

মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে, "এই লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কখনও জমতে দেব না। মানুষটিকে সর্ব্বদা দশ হাত দূরে রাখব। সে কখনও আমার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশতে আসবার সাহসই পাবে না।" সাক্ষাৎকার নিবারণ করতে না পারলেও এরূপ মানুষকে দূরে রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব। সর্ব্বদা আমাদের সংসারে কোন কোন মানুষ সম্বন্ধে এ ভাবে চলবার শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হচ্চে।

এই তুলনামূলক গল্পটিতে মানুষসম্বন্ধে যা বলা হল, অন্তরের প্রবৃত্তিকুল সম্বন্ধে যৌবনে তাই করতে হয়। যৌবন সেই কাল যখন প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে মানবমনের সাক্ষাৎ হওয়া অনিবার্য্য হয়। প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই হবে; প্রবৃত্তিকুলের মধ্যে প্রবল আকর্ষণশক্তি আছে এবং সে আকর্ষণটি নিম্নাভিমুখীন, এ সকল কারণেই প্রবৃত্তিকুল রিপুর সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। প্রত্যেক সুস্থহৃদয় তরুণের মনে একবার অন্তরের প্রবৃত্তিকুল সম্বন্ধে এই প্রশ্ন ও দ্বিধা আসে,—এদের নিয়ে আমি কি করব? এদের কতটা প্রশ্রয় দেব? যে আপনাকে ঈশ্বরের ও সাধুচরিত্র মানুষদের প্রভাবের মধ্যে রাখে, যে প্রথম হতেই সজাগ ও সতর্ক থাকবার পরামর্শটি পায় ও তার অনুসরণ করে, সে বেঁচে যায়। যে অসতর্ক থাকে, তার জীবনের গতি অন্যরূপ হয়। তার পক্ষে, প্রথম সাক্ষাতের পর ভাল লাগা, ভাল লাগার পর সেই সুখের আকর্ষণের অধীন হয়ে পড়া, এবং অবশেষে তার হাতে আত্মসমর্পণ,—এই রূপে এক এক পা অগ্রসর হয়ে এই পিচ্ছিল পথের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে অধিক বিলম্ব হয় না।

প্রবৃত্তি যেন বলে, "দেখছ না, আমি এসেছি।" তার পর বলে, "তুমি যখন একা থাক্‌বে, তোমার মনের ঘরে মাঝে মাঝে আমি উঁকি দিয়ে যাব, আমাকে এই অধিকারটুকু দিও।" তার পর বলে, "খেলার

সময়ে ও আমোদের সময়ে, যখন তোমার কাছে গুরুজনের প্রভাব থাকবে না, যখন তোমার আত্মার শক্তি সকল শিথিল (relaxed) অবস্থায় থাকবে, তখন আমাকে তোমার মনের ভিতরে গোপনে একটু স্থান দিও; দেখো, তাতে বিশ্রামের ও আমোদের স্বাদ কত বেড়ে যাবে।" তার পর বলে, "এবার তোমার মনে আমাকে স্থায়ী বাসা বাঁধতে দাও; আমিই এখন থেকে তোমাকে চালাব।" পথ এত পিচ্ছিল, এবং প্রবৃত্তিসকলের দাবী এরূপ দূরগামী, তাই তারা রিপুপদবাচ্য হয়েছে।

তাই ধর্ম্ম বলেন, "যদি অসতর্ক হও, প্রশ্রয় দাও, বাসনা মাত্রই রিপু হয়ে দাঁড়াবে।" এর বিরুদ্ধে নবযুগের নূতন পরামর্শদাতাগণ নানা কথা বলে থাকেন। তাঁদের দুটি মাত্র কথাকে আমি পরীক্ষা করব। তাঁদের সব কথা এখানে আলোচনা করবার যোগ্য নয়।

নূতন পরামর্শ

(১) সতর্কতার প্রয়োজন নাই; স্বাভাবিক থাক।

এই নূতন পরামর্শদাতাদের মধ্যে একদল স্বাভাবিকতাবাদী। তাঁদের কথা এইরূপ :—"মানুষকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দাও। প্রবৃত্তিসকলকে স্বাভাবিক ভাবে অন্তরে আসা যাওয়া করতে, উদয় ও বিলয় হতে দাও। যা স্বাভাবিক তা নির্দ্দোষ ও নিরাপদ। প্রবৃত্তিকুলের বিষয়ে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবার ও আত্মপরীক্ষা করবার প্রয়োজন কি? স্বাভাবিক জীবন যাপন করে যাও; তাতেই সব ঠিক থাকবে, জীবন নিরাপদ থাকবে।"

কিন্তু, যুগে যুগে, দেশে দেশে, মানুষের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলছে যে, ঐ প্রণালীতে চললে মানবজীবনে সব ঠিক থাকে না; কিছুই

নিরাপদ থাকে না। অসতর্ক জীবনে প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধা অতি শীঘ্রই বেড়ে যায়। আবার একটি গল্প বলি।—

এক গ্রামে একজন চরিত্রবান্ তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন। চরিত্রসম্পদকেই তিনি জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বলে গণনা করেন। তিনি সহজে বড়লোকদের বাড়ী যান না; বড় মানুষদের সব চালচলন তাঁর ভাল লাগে না। গ্রামের জমিদারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হল; তাঁর শ্রদ্ধার দান একখণ্ড ভূমি তিনি গ্রহণ করলেন। জমিদার একদিন সেই পণ্ডিতের বাড়ীতে এসে তাঁকে নিজের ভবনে একটি নাচের মজলিসে একবার পদধূলি দেবার জন্ম সানুনয়ে অনুরোধ করে গেলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটির সে স্থানে যাবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি যখন বুঝলেন, এতক্ষণে নাচ গান হয়তো শেষ হয়ে আসছে, সেই সময়ে একবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। নাচ গান শেষ হল। স্বভাবসিদ্ধ স্পর্দ্ধা সহকারে বাই-ওয়ালী একে একে জমিদারের ইয়ারদের নিকটে এসে তুমি-তুমি বলে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। সকলকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তোমার বাড়ীতে আমি কবে যাব?" শেষে সেই পণ্ডিতের নিকটে এসেও সে সেই বাক্য উচ্চারণ করল। ক্রোধে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব শরীর কাঁপতে লাগল; মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। তাঁর মনে হতে লাগল, এখনই পায়ের চটি খুলে ওর স্পর্দ্ধার প্রতিফল প্রদান করি। কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় সম্ভ্রান্ত বন্ধুর বাড়ী। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। জমিদার তাঁর ভাব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকটিকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী চলে গেলেন। একজন পতিতা নারীর মুখ হতে "তোমার বাড়ীতে আমি কবে যাব"—এ কথা কাণে শুনতে হল বলে আত্মগ্লানিতে ক্ষোভে অনুতাপে তখন তাঁর অন্তর জর্জ্জরিত হচ্ছে। কর্ণ ও অন্তর দুই-ই যেন

অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, যেন এখনও জ্বলছে। মনে মনে বলছেন, "আমি নিজ আদর্শ থেকে নেমে যে এমন স্থানে গিয়েছিলাম, তার উপযুক্ত শাস্তি আমার হয়েছে। এ জীবনে এমন ভুল আর কখনও করব না।"

এই তুলনামূলক দৃষ্টান্তটিকেও অন্তরের জীবনে প্রয়োগ করা যাক্। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি পতিতা নারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুদ্ধচিত্ত মানুষের মাঝে মাঝে নিজ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে শুদ্ধচিত্ত লোকেরও সংসারের পাপমূলক নানা ব্যাপারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। যে মানুষ সাবধান, সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফেরায়। সে এমন করে পশ্চাৎ ফেরে যে, জীবনে আর কখনও সে-পাপ তার সম্মুখীন হতে সাহসী হয় না।

নূতন পরামর্শদাতারা বলেন, "অত খুঁতখুঁতে হ'লে কি চলে? সংসারে চল্‌তে হবে তো? একা একধারে গিয়ে কুণো হ'য়ে ব'সে থাকতে পারবে না তো? তবে অত বাছাবাছি ক'রো না। সকলে যা করে, তাই কর। নিজে ভাল থাক্‌লেই হ'ল।" তাঁরা দু-একটি বিজ্ঞতার বাণীও তরুণদের শুনিয়ে দেন,—"সংসারে চল্‌বে, যেন ধরি মাছ, না ছুঁই পানী"; অথবা, বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

কিন্তু আমি বলি, এ পদ্ধতিতে চলবার ফল কি হয়, তা একবার ভেবে দেখ। একদিন সেই পাপ, সেই রিপু—সৌজন্যের খাতিরে যার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎমাত্র করতে তুমি সম্মত হয়েছিলে, সংসারে দশের সঙ্গে চলবার খাতিরে যাকে তুমি বর্জ্জন করলে না,—সে তোমাকে বলে বসবে, "আমাকে তোমার আত্মার অন্তঃপুরে নিয়ে যাবে কবে?" তখন তোমার সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দশা হবে। যে

প্রবৃত্তিকে পদতলে রাখতে হয়, সে তোমার মাথায় চড়তে চাইবে! কত শীঘ্র সে এমন কথা বলবে, কত শীঘ্র প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধা এত দূর পর্য্যন্ত বেড়ে যাবে, তার কোন স্থিরতা নেই। অতএব বলি, হে তরুণ, যদি তোমার এ ইচ্ছা থাকে যে প্রবৃত্তির মুখ হতে এরূপ মলিন কথা শুনে অন্তরের কর্ণকে কোনও দিন কলঙ্কিত হতে দেবে না, তবে প্রথম হতেই সজাগ থাক, সতর্ক হও। যাঁরা বলেন, "স্বাভাবিক ভাবে চললেই সব ঠিক থাকবে, অন্তরের শুভ্রতা নিরাপদ থাকবে," তাঁদের কথা কাণে তুলো না। তাঁরা সর্ব্বনাশের বাণী বলছেন।

নূতন পরামর্শ

(২) স্বাধীনতা ও আনন্দই জীবনের পথ

নূতন পরামর্শদাতাদের মধ্যে দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন; তাঁরা অবাধ স্বাধীনতাবাদী এবং আনন্দবাদী। আজকাল "স্বাধীনতা" কথাটিকে মানুষ বড় গৌরবের চক্ষে দেখে; তাই এঁরা সে নামের দোহাই দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা স্বাধীনতার নামে প্রবৃত্তি-কুলকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী। এঁদের কথা ঐরূপ—"প্রবৃত্তিসকলকে, বিশেষতঃ যৌবনে উদিত প্রবৃত্তিসকলকে, বাধা দেবে কেন? যৌবনে যে সকল সতেজ কামনা মানব-অন্তরে উদিত হয়, তারাইতো মানুষের জীবনকে ও জনসমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। তাদের বাধা দিলে জীবন সতেজ হয় না, উন্নতি সম্ভব হয় না। অতএব, অবিচারে উচ্চ নীচ সকল প্রবৃত্তিকে অন্তরে অবাধে বাড়তে খেলতে দাও, জীবন সতেজ হবে। তাছাড়া, আনন্দের জন্যও এটা প্রয়োজন। সাহিত্য, কবিতা, অভিনয়, অচল ও সচল উভয়বিধ চিত্র,—এরা সকলে মানবমনের ঐ সকল প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করুক; তাতে বাধা দিও না। ঐ প্রবৃত্তিসকলের

উপরে মৃদু স্পর্শ দিয়ে তাদের অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় রাখলেই সাহিত্যে, কবিতায়, অভিনয়ে, চিত্রে স্বাদ আসে ; নইলে সে সকল আনন্দবিহীন ও বিস্বাদ হয়ে যায়। জীবন হতে আনন্দ কেড়ে নিলে, জীবন ভরে কেবল কতকগুলি শুষ্ক নিষেধমূলক উপদেশ গলাধঃকরণ করতে হলে, বেঁচে থাকা তো মরে থাকার সমান হয়ে যায়।"

এঁরা শুধু এখানেই শেষ করেন না। তরুণদের শুধু নিজ অন্তরের নবোদিত প্রবৃত্তিকুলের প্রশ্রয় দিতে শিক্ষা দেন না। কিন্তু সমাজের অঙ্গে গলৎকুষ্ঠবৎ যে পাপ-ব্যবসায় বর্ত্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে তরুণদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়ে দেবার জন্যও এঁরা ব্যস্ত !

এঁরা তরুণদের বলেন, "বাসনাগুলোকে শত্রু বলে দেখে, তাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে কেন জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করবে ? তাদের প্রথম থেকেই বন্ধু বলে দেখ ; তাদের সঙ্গে বেশ মাখামাখি ভাব রাখ ; তাদের খেলার ও আমোদের সহায় করে নাও। তাদের সঙ্গে বন্ধুতা রেখো, জীবন বেশ ভাল ভাবেই কেটে যাবে।" এঁরা আরও বলেন, "মানুষ অত শুদ্ধতাবাদী না হলেও জনসমাজ বেশ চলে যাবে।"

আমরা বলি, যখন হতে মানুষ রক্তমাংসের জীব, এবং যখন হতে মানুষ আপনার মনের কথা ভাষায় লিখে রেখেছে, তখন থেকে জগতে একই সাক্ষ্য প্রবাহিত হয়ে আসছে। সে সাক্ষ্য এই যে, প্রবৃত্তিগুলিকে পরাজিত শাসিত ও শৃঙ্খলিত করতে পারলেই জীবন নিরাপদ। সে সাক্ষ্য এই যে, প্রশ্রয়-প্রাপ্ত প্রবৃত্তি কখনও সীমার মধ্যে থাকে না। সে সাক্ষ্য এই যে, নিরন্তর আত্মদৃষ্টি আত্মশাসন ও বাসনা-সংযমের দ্বারাই অন্তরকে শুভ্র রাখতে হয়।

প্রবৃত্তিসকলকে দমন করেই মানবাত্মা স্বাস্থ্য শক্তি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাধু আত্মা সে সকলকে এমন বশীভূত করতে পারে যে,

প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও ঈশ্বরের নামে তারা তৎক্ষণাৎ পোষা কুকুরের মত মাথা নোয়াবে। এরই জন্ম ঈশ্বর মানুষের অন্তরে বিবেক-রূপ জাগ্রত প্রহরীকে দণ্ডায়মান রেখেছেন, এবং এরই জন্ম তিনি মানুষের ইচ্ছাতে আত্মসংযমের অপূর্ব্ব শক্তি বিধান করেছেন। এরই জন্ম মানুষকে তিনি পিতামাতার, গুরুজনের ও সাধুভক্তগণের দৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করেছেন। এরই জন্ম মানুষকে তিনি তাঁর দিকে স্বীয় কাতর দৃষ্টি উত্তোলন করে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন।

এই অতি আধুনিক যুগে কি মানুষের প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে, অথবা ঈশ্বরের শাশ্বত নিয়মসকল স্থগিত হয়ে গিয়েছে? না, তা হয়নি। অবাধ প্রশ্রয়ের পরামর্শটি "স্বাধীনতার পূজা," "যৌবনের পূজা," প্রভৃতি নব উদ্ভাবিত যে-কোন নামের দোহাই নিয়ে আসুক না কেন,—কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা জননায়ক যারই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হোক না কেন, উহা ভ্রান্ত, উহা সর্ব্বনাশের বাণী।

সাধকের সহজাবস্থা, ও বিনা সাধনে তার দাবী

সত্য বটে, মানব-অন্তরের কোনও স্বাভাবিক বৃত্তিই মূলতঃ তার শত্রু নয়; কিন্তু প্রশ্রয় পেলেই তা শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এটা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, মানুষের মনোবৃত্তি সকল একদিন তার পরম বন্ধুরূপে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তা কার জীবনে হয়? সুখলোলুপ মানুষের জীবনে তা হয় না; সংযমী সাধকের জীবনেই তা হয়। ধর্ম্মরাজ্যেই এই অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে যে, পরাজিত শৃঙ্খলিত চূর্ণীকৃত শত্রু ক্রমে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের গানে আছে, "আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে প্রভুর সেবার আয়োজন।" বশীকৃত প্রবৃত্তি শুধু আজ্ঞাবহ ভৃত্যই হয় না,

তদপেক্ষাও অধিক হয়; এমন আনন্দের দিনও আসে যখন পরাজিত ও বশীকৃত প্রবৃত্তি সাধকের পরম মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। "তাপসমালা" গ্রন্থে দেখতে পাই, তাপসী রাবেয়া একদিন বলেছিলেন, "ঈশ্বর-প্রেমের বশ হওয়াতে পাপদৈত্যের সঙ্গে আমার সংগ্রাম ও শত্রুতা নাই।" কি আশার বাণী! আত্মজিৎ সাধকের কাছে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সকলই পরম বন্ধু হয়ে যায়। এই জড়জগতের রূপরাশি তাঁকে সেই পরমসুন্দরের লাবণ্য দেখিয়ে দেয়। রসনায় সুমিষ্ট ভোজ্যের স্বাদ তাঁকে পরম আনন্দময়ের মাধুর্য্য আস্বাদন করায়! মানব-হৃদয়ের এমন অসুর যে ক্রোধ, তা-ও সাধকদের চিত্তে অগ্রে তাঁর ধর্ম্মশক্তিতে বশীকৃত হয়ে, পরে জগতের অকল্যাণ দমনে, পাপ দুর্নীতি ও অন্যায়রূপ অসুরের দলনে, মহাশক্তিশালী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধও যে ভক্তের চিত্তে ভগবানের মধুময় প্রেমের ছবি এনে দেয়, ভারতের ভক্তিধর্ম্মের সাধকগণ, ইসলামের সুফী সাধকগণ এবং পশ্চিমের প্রেমিকা মাদাম গেয়োঁ এর জলন্ত সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু কার জীবনে ইহারা এমন বন্ধু? যিনি অগ্রে এদের দমন করেছেন, বশ করেছেন, স্বায়ত্ত করেছেন, তাঁরই জীবনে। ভগবানের নিয়ম এই যে, যদি পরিণত বয়সে এদের বন্ধুরূপে লাভ করতে চাও, তবে প্রথম যৌবনে আগে এদের পরাস্ত কর। যৌবনের পরাজিত ও শৃঙ্খলিত রিপু পরিণত বয়সে মিত্র হয় বটে; কিন্তু অপরাজিত অশাসিত কেবল-লালিত রিপু চিরদিনই রিপু থেকে যায়। ষাট বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষেও তা রিপু যদি তিনি যৌবনে আত্মশাসনের শিক্ষাটি গ্রহণ না করে থাকেন।

তরুণেরা যদি মনে করে থাকে যে কুড়ি বাইশ বৎসর বয়সেই তারা প্রবৃত্তিসকলকে বন্ধুভাবে দেখবার অধিকার লাভ করেছে, কবিকল্পনার

মোহে পড়ে যদি তারা মনে করে থাকে যে সেই প্রার্থিত অবস্থা তাদের জীবনে এখনই এসেছে, তবে তারা আত্মপ্রতারিত।

নবযুগের নব প্রলোভন ; তরুণদের সম্মুখে প্রশ্ন

হে তরুণ, চারদিক হতে নব নব প্রলোভনময় বাক্যস্রোত ও আমোদস্রোত তোমাদের ঘিরছে। তোমরা যদি ধর্ম্মে ও পবিত্রতায় দৃঢ় থাকতে চাও, তবে অগ্রে তার আদর্শ দিয়ে সকল বস্তুকে পরীক্ষা করতে অভ্যাস কর, এবং নব যুগের প্রলোভন সকল সম্বন্ধে মনের চিন্তাকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে নাও। আমরা জানি, আমরা তোমাদের যে সকল বস্তুর সংস্রব হতে দূরে রাখতে চাই, অনেকে সে সকলকে তোমাদের নিকটে নানাভাবে সমর্থন করছেন। য়ুরোপের ball নাচ, স্নান বেশে সজ্জিত নরনারীর সাগরতীরে ভ্রমণ ও রৌদ্র সম্ভোগ, য়ুরোপ এবং এ দেশ উভয় স্থানে কলঙ্কিত অথচ আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ও নারীর চরিত্র নিয়ে রচিত গল্প ও নাটক, ঐরূপ বিষয় ঘটিত অভিনয় ও চলচ্চিত্র, আমোদের জন্য চরিত্রহীন পুরুষ ও নারীর সংস্রবে গমন,— এ সকলের সমর্থনসূচক অনেক উক্তি তোমাদের কর্ণে এসে পৌঁছচ্ছে। যদি জিজ্ঞাসা কর, এ সকলের দ্বারা কি জনসমাজ নষ্ট হয়ে যায়, ভগ্ন হয়ে যায়? তবে আমি বলি, জনসমাজকে রাখবার কিংবা ভাঙ্গবার মালিক আর একজন আছেন। যুগে যুগে মানুষের মনের সকল স্রোতকে নিজ নিগূঢ় নিয়মে নানাভাবে নিয়মিত করে তিনি মানব-সমাজকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তোমার ভাববার বিষয় তো তা নয়! তোমার ভাববার বিষয় এই যে, ঐরূপ দৃশ্য দেখে, ঐরূপ পুস্তক পড়ে, ঐরূপ অভিনয়ে যোগ দান করে, তোমার অন্তরের নিকৃষ্ট বৃত্তির সঙ্গে তোমার মাখামাখি ভাব বন্ধুতার ভাব দাঁড়িয়ে যায় কি না? তোমার হৃদয়ের

অন্তঃপুরে, যেখানে কেবল তোমার ঈশ্বরের ও তোমার পবিত্র সঙ্কল্পসকলের প্রবেশাধিকার, সেখানে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকলকে গোপনে দেখা দেবার অধিকার দান করা হয় কি না? ক্রমশঃ সে অন্তঃপুর দখল করে নেবার জন্য শত্রুকে নিমন্ত্রণপত্র দান করা হয় কি না? তুমি কি তোমার অন্তরের সেই অন্তঃপুরকে পরমেশ্বরের ও সাধুভাবসকলের বিহারভূমি করে রাখতে চাও? তাকে শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক রাখতে চাও? তবে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে শত্রু বলেই জান; তার সঙ্গে মাখামাখি করো না; তাকে মনের দরজা হতেই ঘৃণার সঙ্গে ফিরিয়ে দাও।

নবযুগের তরুণদল, তোমাদের বিশেষ করে জিজ্ঞসা করি, তোমরা কোন পথ ধরবে? "প্রবৃত্তিসকলকে নিয়ে খেলা করা নির্দোষ কাজ," এরূপ কথা যদি কারও নিকট হতে তোমাদের কর্ণে পৌঁছে থাকে, তবে বলি, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় গুরুজনগণের সাক্ষ্য একবার শ্রবণ কর। শোন, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেঁদে কেঁদে গেয়েছিলেন—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়!
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পূজিব তোমায়?
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়?
এ পাতকী নরাধমে তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধ'রে দাও চরণে আশ্রয়।"

শোন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলছেন,—"সহে না সংগ্রাম, আমি নারিনু রোধিতে দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলে মোর!" শোন শিবনাথ প্রার্থনা করছেন, "দাও শক্তি শক্তিশালী-প্রবৃত্তি দলনে; দাও

জ্যোতি, জ্যোতির্ম্ময়, এ অন্ধ নয়নে!" শোন, শিবনাথ আরও বলছেন,—"ভাই রে! গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়, বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।"

কত আর বলব? ধর্ম্মজগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। পবিত্র জীবন যাপনের জন্য যেখানে যিনি আকাঙ্ক্ষিত, তাঁদেরই জীবন এই প্রবৃত্তি-সংগ্রাম অনুতাপ ও ক্রন্দনের সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ। নূতন যুগে কি পবিত্রতার পথ পুষ্পাস্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে? না, তাহা হয় নাই। তোমরা অনেকে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে দেখ নাই, আচার্য্য শিবনাথকে দেখ নাই। আচ্ছা, তোমরা তোমাদের অধম দাসের সাক্ষ্য শুনবে? তবে শোন। যখন তোমাদের মতন বয়স আমার ছিল, আমাকে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলতে হয়েছিল,—"এখন যে যৌবনের প্রবৃত্তির অমানিশা, এখন চলিতে পথ আঁধারে পাই না দিশা, (কবে) ঘুচিবে এ অন্ধকার, ঘুচিবে এ হাহাকার? পবিত্র জীবনে কবে গাহিব তোমারি জয়?" না, না! "প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে খেলা করা চলে,"—এমন সাংঘাতিক কথা কখনও বিশ্বাস করো না।

অর্দ্ধ-জাগরিত প্রবৃত্তি

যে শ্রেণীর সাহিত্য কবিতা চিত্র ও অভিনয় সম্বন্ধে আমি তোমাদের আজ সাবধান করছি, তাতে মানব মনের নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলকে অর্দ্ধ-জাগরিত ক'রে তাদের সঙ্গে যেন খেলা করা হয়। এই ঈষৎ জাগরিত অস্পষ্ট ভাবটি থাকে বলে অনেক অভিভাবক নিজ নিজ পুত্রকন্যাগণকে ঐ সকল বিষময় বস্তু সম্বন্ধে সাবধান করতে ভুলে যান। কত সময় তাঁরা নিজেরা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, অথবা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পুত্রকন্যাগণকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করে দেন। প্রবৃত্তির

ধর্ম্মই এই যে, তা' প্রথমতঃ খেলার বস্তু হয়ে মনকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু অধিক দিন আর তা খেলার বস্তু হয়ে থাকে না। অতি শীঘ্রই শত্রু নিজ মূর্ত্তি ধরে আত্মাকে আক্রমণ করে, ভূপতিত করে, তার রক্ত চুষে খায়।

আর একটা গল্প বলি। একজন ভারতবাসী ইংরেজ একটি বাঘের ছানা পুষেছিলেন। সেটি বেশ পোষ মানল। অতি সুন্দর লীলাময় ভঙ্গীতে সে নানা খেলা করত, সর্ব্বদা সাহেবের কাছে কাছে থাকত। অভিজ্ঞেরা সকলেই সাহেবকে বললেন, "একে নিয়ে খেলা করবেন না। হঠাৎ এর হিংস্র প্রকৃতি জেগে উঠবে। তখন আপনাকে বিপন্ন হতে হবে।" কিন্তু সাহেব তা শুনলেন না ; তিনি উহার খেলা ধূলায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। কয়েক মাস এ ভাবে কেটে গেল। তার পর একদিন সাহেব ঈজি চেয়ারে বসে পড়ছেন, তাঁর বা হাতখানি পাশে ঝুলে রয়েছে, বাঘের ছানা সেই হাতখানি চাটছে, মাঝে মাঝে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাতখানি মুখের ভেতর নিয়ে কামড়াবার ছল করে খেলা করছে। ক্ষণকাল পরে সাহেব হাতের এক স্থানে একটু বেদনা অনুভব করলেন। দেখলেন, হাতের এক স্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে, বাঘের ছানা সেই রক্ত চেটে খাচ্ছে। হাত টেনে নেবার উপক্রম করতেই বাঘ ঘোঁ ঘোঁ শব্দ করে অসন্তোষ জানাল ; তার লেজ ফুলে উঠল, চক্ষু জ্বলতে লাগল। সাহেব বুঝলেন, এই মুহূর্ত্তে আমার খেলার সাথীটি রক্তের স্বাদ পেয়ে সত্যকার বাঘে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর একে রাখা নয়! এই মুহূর্ত্তেই একে নিঃশেষ করা দরকার। সাহেব চাকরকে ডেকে বললেন, ভরা বন্দুক নিয়ে আমার পশ্চাতের দরজায় দাঁড়াও ; ঠিক নিশানা কর ; গুলি কর ! (Take good aim and shoot)— সাহিত্যে, অভিনয়ে, চিত্রে, প্রবৃত্তির খেলা দেখবার আয়োজন যাঁরা

করেন, অন্তরের সুপ্ত ব্যাঘ্রপ্রকৃতির শত্রু কোনও দিন অতর্কিত ভাবে জেগে তাঁদের আক্রমণ করবে, আত্মার রক্ত শোষণ করবে।

প্রার্থনা-রক্ষিত জীবন

তাই বলি, সুখপূজার কোন মন্ত্রণা শুনো না। এই যৌবনেই, অন্তরে যা সত্য শিব সুন্দর, তাকে বিকশিত কর; মানব-জগতে যা সত্য শিব সুন্দর, তার অনুচর হও; এবং সেই সত্যং শিবং সুন্দরমের সঙ্গে আত্মাকে মিলিত কর। তোমাদের হৃদয় হতে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা নিরন্তর তাঁর দিকে উত্থিত হোক।

কবি সেই কুমারীকে "বহু প্রার্থনার ধন" (child of many prayers) বলেছিলেন। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পিতামাতাকে বলো, অভিভাবককে বলো, বন্ধুজনকে বলো, "যৌবনের পথে চললাম, প্রার্থনার দ্বারা আমার জীবনকে ঘিরে রাখ।" তোমরা অনুভব করো, সকল সাধু ভক্তগণের প্রার্থনা, যাঁরা অমরলোক হতে ব্যাকুল নয়নে আপনাদের উত্তরবংশীয় বলে তোমাদের দেখছেন, তাঁদের প্রার্থনা, তোমাদের বেষ্টন করে আছে। মধ্যে তোমার নিজের অন্তরের প্রার্থনার অগ্নি, চারিদিকে তোমার পূজ্যগণের প্রার্থনার অগ্নি, —এই ভাবে প্রার্থনা-বেষ্টিত হয়ে তোমরা প্রতি জন মঙ্গলের পথে নিত্য অগ্রসর হও।

১৭ই নভেম্বর, ১৯২৯

যৌবন ও সমাজ

মানুষের জীবনে যৌবন এমনই মূল্যবান যে মানুষ তাকে চিরজীবী করে রাখতে চায়। পশ্চিমে একটি শপথ প্রচলিত আছে, বাংলা দেশে তা নাই। বাংলা দেশে যেমন বলে, মাথার দিব্য, সন্তানের দিব্য, পশ্চিমে তেমনি আর একটি দিব্য আছে; তা, জবানী কসম্, অর্থাৎ আমার যৌবনের দিব্য। যৌবনকে তারা এমনই মূল্যবান মনে করে যে তার নামে তারা শপথও করে থাকে।

আদর্শ, ব্যাকুলতা, উদ্যম

কেন মানুষ যৌবনকে এত মূল্য দেয়? যৌবনই যেন মানবজীবনের সার ভাগ,—কেন মানুষ এইরূপ অনুভব করে? সারা জীবনে মানুষ যত বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তার স্মৃতি প্রবল হয়ে, বার্দ্ধক্যে তার উৎসাহকে একটু খর্ব্ব করে দেয়, তার আশাকে একটু নিষ্প্রভ করে দেয়, তার প্রফুল্লতা ও কৃতজ্ঞতার সুরটিকে একটু মৃদু করে দেয়। যৌবনে সে নিস্তেজ ভাব থাকে না। যৌবনে মানব-অন্তরের উন্নত আদর্শগুলি তাকে ব্যাকুল ও উদ্‌যোগী করে রাখে। উন্নত আদর্শ ও তৎপ্রসূত আশাশীলতা, ব্যাকুলতা ও উদ্যম,—ইহাই যৌবনের প্রধান লক্ষণ; ইহার জন্যই যৌবনের এত মূল্য। যৌবনের বাণী এই,—"আমি কিছু হতে পারি; আমায় কিছু হতে হবে; আমি কিছু হব।" যার মন এ কথা বলে না, যার জীবনে কোন আদর্শ নাই, আদর্শ-প্রসূত কোন ব্যাকুলতা নাই, উদ্যম নাই, তার বয়স যা-ই হোক,

সে যুবক নয়। যার প্রকৃতিতে ইহা আছে, তার বয়স যা-ই হউক, সে যুবক।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজ। ধর্ম্ম, নীতি, উন্নত চরিত্র, বিবেকানুগতা, জীবনের মহৎ লক্ষ্য, সেবায় আত্মোৎসর্গ,—এ সকলই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ। এই সমাজের তরুণ তরুণীদের জীবন হতে কি-বাণী নিঃসৃত হবে?—"আমরা জেনেছি, আমাদের জীবন ধর্ম্মভাবের দ্বারা উন্নত ও স্নিগ্ধ হতে পারে; মানব-সংসারে যেখানে যে-কোন মহৎ আদর্শ প্রকাশ পায়, আমরা তার অনুসরণ করতে পারি; আমাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্র হতে পারে; আমরা সত্যের ন্যায়ের ও পবিত্রতার সেবক হতে পারি; আমরা চরিত্রের দ্বারা আমাদের চারিদিকে এক একটি আলোক-মণ্ডল রচনা করতে পারি।—আমরা এ সকল পারি, আমরা এ সকল করব; এবং আমরা এ সকলে সিদ্ধিলাভ করব।"—ইহাই তরুণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার যৌবন-বাণী। ইহাই "যৌবনের জয়গান।"

কাহারও মধ্যে যৌবন আছে কি নাই, যৌবন জীবিত না মৃত, তা বুঝবার পরীক্ষা এই,—দেখ যে মানুষটির অন্তরে আদর্শে বিশ্বাস, আদর্শে আস্থা, আদর্শে আত্মনিয়োগের ভাব আছে কি নাই। যে বয়সকে লোকে যৌবন বলে, সেই বয়সেই অনেক দুর্ভাগ্য নরনারী স্বীয় যৌবনকে হত্যা করে রাখে। যৌবনকে কি আবার হত্যা করা যায়? হাঁ, করা যায়। এমন কতকগুলি বিষ আছে যা প্রয়োগ করে যৌবনকে বিনষ্ট করা যায়। সে বিষ-বড়ি সেবনের ফলে, আদর্শে আস্থা ও আদর্শের জন্য ব্যাকুলতা, এই লক্ষণগুলি অন্তর হতে লুপ্ত হয়ে যায়।

এমন একটি বিষ বড়ি হল, সুখাসক্তি বা আরামপ্রিয়তা। ইহা নিশ্চেষ্ট আরামপ্রিয়তার আকারেই আসুক, কি সচেষ্ট সুখলোলুপতার আকারেই প্রকাশিত হোক, এ বস্তুটি যৌবনের পরম শত্রু। অনেক

তরুণ তরুণী এই বিষের দ্বারা আপনার যৌবনকে ধ্বংস করে রাখে। তারা বলে, "খাও দাও, সুখে থাক। কেন ধর্ম ধর্ম করে, নীতি নীতি করে, মানুষের সুখের জীবনে অশান্তির সৃষ্টি কর? কলেজের হাজরীর সময়ে দুটা মিথ্যা কথা বললে তেমন কিছুই ক্ষতি হয় না। ব্রাহ্ম হয়ে 'আমি ব্রাহ্ম' এটা জানাতে সঙ্কুচিত হলে তেমন কিছুই অপরাধ হয় না। এ সকল নিয়ে কেন অশান্তি কর? পাপ-পুণ্যের বেশী বাছাবাছি করা একটা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মাত্র।" যাদের মুখে এইরূপ বুলি শুনতে পাওয়া যায়, তাদের যৌবন মরে গেছে। তারা ভীরু। যে-প্রকৃতির এক পিঠের নাম আরামপ্রিয়তা, তারই অপর পিঠের নাম সংগ্রাম-ভীরুতা। হে তরুণ, হে তরুণী, যদি তোমাদের যৌবনকে বাঁচাতে চাও, যদি নৈতিক ভীরুতার স্তরে নেমে গিয়ে হেয় হতে না চাও, তবে এই বিষ হতে সাবধানে আত্মরক্ষা কর।

সুখলোলুপতার অবশ্যম্ভাবী ফল, আত্মার জড়ত্ব! আফিঙের ফলে যেমন শরীরে জড়তা আসে, সুখাসক্তির ফলে তেমনি আত্মায় জড়ত্ব আসে। আত্মার হবার কথা, স্বচ্ছ মণির মত; সুখাসক্তির ফলে সেই আত্মা হয়ে যায় মাটির ডেলার মত। সংস্কৃত কবি বলেছিলেন, "প্রভবতি শুচি র্বিম্বোদগ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ"। স্বচ্ছ মণির উপরেই প্রতিবিম্ব পড়ে, মাটির ডেল্যায় তা পড়ে না। বিশ্বজগতে যা কিছু সুন্দর ও মহৎ, তার প্রতিবিম্ব অন্তরে ধারণ করতে চাও? তবে স্বচ্ছ মণির মত প্রাণ নিয়ে এস; মাটির ডেলা হলে চলবে না। আদর্শে আস্থা ও আদর্শ-পূজাই হল তরুণ আত্মার সেই স্বচ্ছতা, সেই শুচিতা যাতে সে মণির মত হয়। আদর্শের জন্য যে-মানুষ মত্ত হতে জানে না, তার আত্মা মাটির ডেলা হয়ে গিয়েছে। তার দেহের বয়স যা-ই হোক, তার আত্মা বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত।

যৌবন-বিনাশের আর একটি বিষ-বড়ি, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা। এই বিষে যার আত্মা জর্জ্জরিত, সে কোথাও কিছু ভাল দেখে না, কোথাও তার শ্রদ্ধা জাগে না। এক জন সাধু পুরুষ এলেন; আর দশ জন যুবক তাঁর কাছে ছুটে গেল। কিন্তু সে লোকটি বলে, 'ও সব তোমরা কর গিয়ে। আমার সকলকেই জানা আছে। সকলেই সমান; কেবল কারো কারো দোষগুলি প্রকাশ হয় না, তাই তাঁরা মস্ত সাধু হ'য়ে বসেন।' এই ভাবের অবিশ্বাসের ও অশ্রদ্ধার উক্তি অনেক সময়ে যুবকদের মুখেও শুনতে পাওয়া যায়। তখন বড়ই খেদ হয়। হায় হায়, তারা নিজেদের অমূল্য যৌবনকে হত্যা করে রেখেছে। শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষ দেখলে, শ্রদ্ধার যোগ্য আচরণ দেখলে, তৎক্ষণাৎ তাজা শ্রদ্ধায় আপাদমস্তক অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠা, আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধায় চালিত হয়ে সেই আদর্শ অনুসরণ করতে ব্যগ্র হওয়া,—ইহাই প্রকৃত যৌবনের লক্ষণ। অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা cynicism,—এ সকল আত্মার যৌবন-বিনাশের অতি সাংঘাতিক বিষ-বড়ি।

যেখানে যৌবন তাজা আছে, সেখানেই মানব-অন্তর নানা উন্নত আকাঙ্ক্ষার আধার। সেখানেই দেখি, আরও উন্নত, আরও পবিত্র, আরও মহৎ হবার জন্য, আপনাকে নিরন্তর তপস্যায় নিয়োগ করবার জন্য মন ব্যাকুল। বড় বড় বাড়ীর প্রকাণ্ড কড়িকাঠগুলি দীর্ঘকাল ধরে দেয়ালের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু এতে কারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না বা কারও মনে কোন আশঙ্কা হয় না। কিন্তু আজ যদি একটি বটের কোমল চারা বাড়ীর দেয়ালের কোন স্থানে উদ্গত হতে দেখা যায়, অমনি সকলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেন ব্যস্ত হয়? কারণ, বটের কোমল চারাটির ভবিষ্যৎ আছে। সে কিছু হবে, সে বাড়বে, সে আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না। বল, তুমি কি ঐ মৃত

কড়িকাঠ? না, জীবন্ত বটের চারা? তোমার জীবনের সম্মুখে কি কোন উন্নত লক্ষ্য আছে? কোন আদর্শ আছে? না, "খাও দাও সুখে থাক" এই স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছ?

আদর্শ-পূজার বাহ্য আকার সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একরূপ হবে না। প্রত্যেক মানুষ নিজ রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করবে। যদি জ্ঞানের উন্নতি তোমার জীবনের আদর্শ হয়, বেশ, জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত হও। যদি ধর্ম্মকে আদর্শ কর, ধর্ম্ম-তপস্যাতেই নিযুক্ত হও। যদি দেশ-সেবা তোমার আদর্শ হয়, তাতেই আপনাকে নিয়োগ কর। যদি সমাজের সেবা তোমার আদর্শ হয়, এস, সাদরে তোমাকে আহ্বান করি; নিষ্ঠার সঙ্গে তাতে আপনাকে নিয়োগ কর। কিন্তু কোন না কোন একটি আদর্শ প্রাণে থাকা চাই; তা দিয়ে আপনাকে বাঁধা চাই; তার হাতে আপনাকে সমর্পণ করা চাই। ইহাই যৌবনের লক্ষণ।

নির্ব্বাচন

যৌবনের একটি বিশেষত্ব এই যে মানবজীবনে এ সময়ে নির্ব্বাচনশক্তি প্রথম জাগরিত হয়। জন্ম হতে মরণ পর্য্যন্ত ঈশ্বর মানুষকে নিরন্তর কিছু না কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বাল্যে কিছু দেন, কৈশোরে কিছু দেন। যৌবনে তিনি অনেক কিছু দেন। কিন্তু যৌবনে সেই দানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তিনি প্রথম এই কথা বলেন, "আমি যা যা তোমাকে দিলাম তার মধ্য হতে তুমি নির্ব্বাচন কর, তুমি কোন্‌টিকে জীবনে প্রধান বলে অবলম্বন করবে। তোমার জীবনের লক্ষ্য কি হবে?—সুখ? আরাম? মান? ধন? না, আমার অধীনতা, আমার হওয়া?" যৌবনে ঈশ্বরের এই বাণী অন্তরে বার বার ধ্বনিত হতে থাকে।

বাল্যে ও কৈশোরে মানব-মন অনেকটা খেলার ভাবে পূর্ণ থাকে। যৌবনে মনের সকল ভাব, সব প্রীতি, সব আকাঙ্ক্ষা অধিক প্রগাঢ়, অধিক গভীর হয়। যার প্রকৃতি যত শীঘ্র গভীর ও গম্ভীর হয়, সে তত শীঘ্র ঈশ্বরের ঐ বাণী অন্তরে শ্রবণ করে।

বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েরা খেলাতে মত্ত রয়েছে। সকলেই ভাবছেন, এদের খেলাধূলার জীবন আরও কিছুকাল চলবে। কিন্তু হঠাৎ বাড়ীতে একজনের অসুখ করল। অমনি তাদের সকলের হৃদয়ের প্রীতি যেন এক মুহূর্তে গভীরতা ও গাঢ়তা লাভ করল। আপনা হতে তারা তাদের নির্দ্দোষ আমোদ খেলা ত্যাগ করে ব্যাকুল প্রাণে সেবার কাজে লেগে গেল। এখানে অন্তরে গভীরতা সঞ্চারের একটি দৃশ্য দেখা গেল। মানবজীবনে যৌবন সেই কাল যখন অন্তরের প্রত্যেক ভাব তরলতা পরিত্যাগ করে গাঢ় হতে থাকে, এবং যখন সেই গাঢ় ও গভীর ভাবসকল আত্মাকে আত্মত্যাগের ও নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ করে তোলে। ঈশ্বরও যেন এ সময়ে মানব-অন্তরে বলেন, "একবার তাকাও আমার দিকে ! এবং বল, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি হবে ? যারা ঈশ্বরের গভীরপ্রকৃতিসম্পন্ন পুত্র কন্যা, তাঁরা যৌবনে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে তাঁর কত আদেশ গ্রহণ করেন। তাঁরা কত সময়ে তাঁর আদেশে কত নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদকেও বর্জ্জন করেন। কত কঠোর কর্ত্তব্যকে, বিবেকের কত কঠিন আদেশকে তাঁরা সাদরে বরণ করে নেন।

গভীরতার কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ ;

মিতভাষী, মিতব্যয়ী, দানব্রত

যে নির্ব্বাচন ও ত্যাগকে আমি অন্তরের দিক থেকে যৌবনোচিত গভীরতার চিহ্ন বলে বর্ণনা করছি, তাকে কাজের দিক থেকে বিচার

করে দেখা যাক্। আমাদের সময় শক্তি ও অর্থ, সবই পরিমিত। এজন্য পদে পদে আমাদের বেছে নেওয়া প্রয়োজন হয় যে, কি করব ও কি করব না। আমাদের সময় পরিমিত। একজন কর্ম্মপটু ব্যবসায়ীর কাছে একটি ভদ্রলোক দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে কোন কাজের প্রস্তাব করেন না, কিন্তু অনেক আপ্যায়ন-সূচক কথা বলেন। তাই দেখে ব্যবসায়ীটি শেষে বলে উঠলেন, "Are you in earnest? Do you mean business?" অর্থাৎ "এ সব কথা থাকুক; কাজের কথা কিছু থাকে তো বলুন। আপনার কিছু কারবার করবার মতলব আছে কি না, তাই যে এখনও বুঝতে পারছি না!" ব্রাহ্মসমাজের কাজ করব বলে যখন কোন তরুণ বা তরুণী দণ্ডায়মান হন, তখন যেন ভগবানের ঐ বাণী শুনতে পাই। ঈশ্বর যেন বলেন, "সত্যি সত্যি কি আমার কাজে খেটে দিতে এসেছ? তবে কথার বাজে খরচ, সময়ের বাজে খরচ বন্ধ কর। ঠিক কিসে খাটবে, ও কতখানি সময় তাতে ব্যয় করবে, তা স্থির করে ফেল; এবং অবিলম্বে সে-কাজে লেগে যাও!"—দশটা কাজের আলোচনা করার চেয়ে একটা কাজে খাটতে আরম্ভ করে দেওয়া অনেক ভাল। মানুষের সময় পরিমিত। যে-মানুষ কথার কিংবা সময়ের বাজে খরচ করে, সে আদৌ কিছু কাজ করবে কি না, তাতেই সন্দেহ হয়। কখনও সে সারবান মানুষ হবে কি না তাতে সন্দেহ হয়। যে-যুবক যে-যুবতী ফেনিল বাক্যোচ্ছ্বাস বন্ধ করতে পারে না, সে এখনও যৌবনোচিত গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় নি।

তেমনি আমাদের অর্থও পরিমিত। যৌবনোচিত গাম্ভীর্য্য যার হয়েছে, সে সর্ব্বদা এ কথা মনে রাখে; এবং তার পরিমিত অর্থ হতেই সে সৎকার্য্যে ব্যয় করবার ব্যবস্থা করে। যে-মানুষ কল্পনা করে যে আগে বেশী টাকা হোক, তখন ব্রাহ্মসমাজে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য

করতে আরম্ভ করব, তার সে আরম্ভ করবার দিনটি আর আসে না। যে-মানুষ মনে করে, অনেক অবসর হলে তখন ব্রাহ্মসমাজের জন্য খেটে দিতে আরম্ভ করব, কাজ আরম্ভ করবার মত অবসর তার জন্য আর আসে না। তোমরা যদি পয়সা দিতে চাও, যদি শ্রম দিতে চাও, তবে প্রথম হতেই উভয় বিষয়ে মিতব্যয়ী হও। প্রথম হতেই যেটুকু বাঁচাতে পার, বাঁচাও, ও সেটুকুই দাও। যার মনে দরদ থাকে, সে টানাটানির মধ্যেও ত্যাগ স্বীকার করে পয়সা বাঁচায়, সময় বাঁচায়। দরদ না থাকলেই সে 'এখন নয়' বলে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে দেয়।

বাড়ীতে যখন অসুখ হয়, তখন প্রয়োজনের চাপে শিশুদের প্রাণের প্রীতি গভীর ও গাঢ় হয়ে উঠে; তা সঙ্কল্পের আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাদের জিজ্ঞাসা করি, মাতৃসম এই সমাজের প্রয়োজন, অতি গুরুতর প্রয়োজন, কি তোমাদের মনের উপরে চাপ দেয় না? তোমরা কি এই প্রয়োজনের চাপে মিতব্যয়িতায় দৃঢ় হবে না? ব্রাহ্মসমাজের খাতিরে একটি একটি করে পয়সা, একটি একটি করে মিনিট বাঁচাতে কি শিখবে না? আমি বলি, দাও, তোমাদের আমোদ আহ্লাদ থেকে কেটে রোজ আধ ঘণ্টা মাত্র সময় দাও; তোমাদের মাসিক ব্যয় হতে কেটে চার আনা করে পয়সা দাও। তা হলেই তোমাদের যৌবনোচিত প্রকৃতির সারবত্তার পরিচয় দেওয়া হবে। মনে করো না যে ধনীদের উদ্বৃত্ত টাকার দান দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চলছে। দরিদ্রদের কষ্টে-জমানো ও দরদে-দেওয়া পয়সা দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ চলছে ও চলবে। তোমরা প্রস্তুত হও তো! তোমাদের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থার নূতন যুগ আসতে পারে; তোমাদের একটি একটি করে জমানো পয়সা দিয়েই ব্রাহ্মসমাজে সচ্ছলতার দিন আসতে পারে।

বিলাসিতা ত্যাগ কর; অনাবশ্যক সমুদয় ব্যয়কে সঙ্কুচিত কর। চারিদিকের অবস্থা দেখে, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দেখে, তবু কি তোমাদের মনে মিতাচারের ও মিতব্যয়িতার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প আসবে না? তোমরা কি ব্রতী হয়ে তপস্বী হয়ে চলতে আরম্ভ করবে না? শাস্ত্রী মহাশয় একদিন লিখেছিলেন,—

"ওরে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
আর সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে, তবে রে উল্লাসে
নাচিব গাইব সকলে মিলিয়ে।
যতদিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশা ভারত-আকাশে;
আশার সলিতা রাবণের চিতা
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।"

আজ ঐ কথাগুলি সকলের জপ-মন্ত্র হওয়া উচিত। দেশের দিকে চেয়ে, ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে, তোমরা সব বিলাসিতা, অনাবশ্যক সব ব্যয় বর্জ্জন কর; এবং ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা সঞ্চিত এক একটি পয়সা ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের কাজে উৎসর্গ করে ধন্য হও।

সেবা-ব্রত

এতক্ষণ সময়ের ও অর্থের ব্যবহারের কথাই বললাম। শক্তির ব্যবহারের দিকটি ভাবতে গেলে মনে হয়, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় না থাকলে মানুষের চরিত্রও গড়ে না, মানুষের অবলম্বিত সেবা-ব্রতও নির্ভরযোগ্য হয় না। আমাদের চরিত্রে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের অভাব

নাই বলে ব্রাহ্মসমাজে কত কাজ আরম্ভ করা হয়, কিন্তু তা শেষ করা হয় না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এই প্রকার কত অসমাপ্ত কাজের, কত অমুদ্‌যাপিত ব্রতের দ্বারা কলঙ্কিত! এরূপে অসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে রেখে এখন আমাদের প্রকৃতি এমন হয়ে গিয়েছে যে আমরা এইজন্য লজ্জা অনুভব করতেও ভুলে গেছি! এ দেশের মানুষের সম্বন্ধে একটি এই অপবাদ আছে যে এরা উত্তেজনা ছাড়া কোন কাজ করতে পারে না। যতক্ষণ উত্তেজনা থাকে, ততক্ষণ কর্মক্ষেত্রে কর্মীর ভিড় দেখা যায়; উত্তেজনার যোগান দিতে না পারলেই সেই কর্মীরা সরে পড়ে। শুষ্ক খাটুনির দিনে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ছি ছি! দেশের এই অপবাদ কারা দূর করবে? ব্রাহ্ম যুবক যুবতী, তোমরা কি ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্রে এসে দেখাতে পারবে যে তোমরা এই অপবাদের ঊর্দ্ধে উঠেছ?

বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠে" দেখা যায়, সত্যানন্দ দেবতার কাছে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করলেন, "আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ হবে না?" দৈববাণী হল, "তুমি কি-পণ করতে পার?" সত্যানন্দ বললেন, "প্রাণ পণ করতে পারি।" উত্তর হল, "প্রাণ তো সকলেই দিতে পারে; আরো কিছু চাই।" সত্যানন্দ বললেন, "আর আমার দিবার কি আছে?" উত্তর হল, "আত্মদান চাই, আত্মসমর্পণ চাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রাণদান অপেক্ষাও আত্মসমর্পণকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। প্রাণদানও অবশ্য মহা দান। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিকের মধ্যে প্রাণদান করা তত কঠিন কর্ম নয়। তিল তিল করে আপনাকে দান করা, দৈনিক নানা দুঃখ কষ্ট সংগ্রামের মধ্যে আদর্শকে দৃঢ় হস্তে ধরে থাকা, শুষ্ক কঠোর সেবা ব্রত বৎসরের পর বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে যাওয়া,—এ বড় কঠিন। কিসে এই একাগ্রতা ও

অধ্যবসায় আমরা সাধন করতে পারি, তা আমাদের ব্যাকুল হয়ে চিন্তা করা উচিত।

একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বিষয়ে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কত দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রয়েছে। সে সকল আমরা শুনি ও পড়ি বটে, কিন্তু এখনও তা আমাদের চরিত্রে বসলো কই? এই সেদিন Edison পরলোকে চলে গেলেন; তাঁর জীবন কি আশ্চর্য্য একাগ্রতার দৃষ্টান্ত! Smilesএর বইয়েতে Pallisyর কথা অনেকেই পড়েছি। তিনি নিজ চেষ্টার দ্বারা চীনে-মাটির বাসনে রং ধরানো শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর কি একাগ্রতা ছিল! ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্ম ক্রমে ক্রমে তাঁর সব সম্পত্তি ব্যয়িত হয়ে গেল। যখন তাঁর পরীক্ষার চরম সময় উপস্থিত, তখন চুল্লীর আগুনকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না; কারণ, কাঠ কিনবার আর সঙ্গতি নাই। তখন তিনি টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে চুল্লীতে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর পত্নী মনে করলেন, স্বামী বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছেন। পত্নীর ডাকাডাকিতে যখন প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন, তখন Pallisyর পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে; তখন তিনি কৃতকার্য্য। তাঁর চুল দাড়িতে ছাই মাখা, কিন্তু তিনি হেসে বন্ধুদের বললেন, "হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে!" কি একাগ্রতা! কি অধ্যবসায়!

শুধু বড় বড় বিষয়ের কথাই বা ভাবি কেন? একজন দোকানদারকে দেখ। রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ডের বাজনা এল; ক্রেতারা মুখ ফিরে সেই তামাসা দেখতে লাগল। দোকানদার সেই অবসরটুকুর মধ্যেই, ক্রেতাদের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পণ্যগুলি আবার সুশৃঙ্খল করে সাজিয়ে রাখল। এই কষ্টকর কাজটি সে দিনের মধ্যে হাজার বার করচে। এখানে দেখতে পাই, কেমন বিরক্তিবিহীন ও অভিযোগবিহীন নির্ব্বাক অধ্যবসায়! এমন না হলে কোন দোকান চলে না। পরীক্ষার্থী ও

পরীক্ষার্থিনী ছাত্র ছাত্রীরা মাসের পর মাস কত আমোদ আহ্লাদ হতে আপনাদের বঞ্চিত রাখেন ; কত বিরক্তি কত অসুবিধা মুখ বুজে সহ্য করেন ! এখন বল দেখি, যদি বিনা-একাগ্রতায় বিনা-অধ্যবসায়ে ছোট কাজ সফল না হয়, তবে কি বড় কাজ সফল হতে পারে ? দোকান চালাতে গেলে, পরীক্ষায় পাস করতে গেলে, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় চাই,—আর সমাজের ও দেশের কাজ কি "আজ আছি কাল নাই" এ ভাবে করলেও চলে ? এস, আমাদের জাতিগত এই শিথিল প্রকৃতিকে আমরা বদলে ফেলি। এস, দৃষ্টিকেও আমরা বদলে ফেলি। বেছে বেছে সেই ছেলে মেয়েদেরই মূল্য দান করি, তাদেরই সম্মান দান করি, যারা শোরগোল করে না, কিন্তু ছোট ছোট এক একটী কাজ হাতে নিয়ে নীরব নিষ্ঠার সঙ্গে খেটে যায়।

অখ্যাত ও নীরস কর্ম্ম

এই সূত্রে আর একটি কথা মনে হয়। সেবাব্রতে যে-ব্রতী, তার মনের ভাব এই হবে যে ক্ষুদ্রতম নিম্নতম শুকতম কার্য্যও ভক্তির সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার ভাবে সম্পন্ন করব। এমন কাজে খেটেও আমি ধন্য হব। এমন অনেক কাজ আছে যাতে রস পাওয়া যায় না, অথবা লোকচক্ষুর সম্মুখে আসা যায় না ; কিন্তু হয়তো তা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। এই রকম কাজকে সাধারণতঃ লোকে drudgery বলে। এই জাতীয় অজ্ঞাত অখ্যাত নীরস নিম্নস্তরের কাজ গ্রহণ করবার ও প্রসন্ন মনে তা সম্পন্ন করবার মহত্ত্ব যুবকদের মধ্যে থাকা চাই। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে, এইরূপ drudgeryর কাজ বিনা কোন মানুষ প্রকৃত কাজের লোক হয় না। এ প্রকার drudgeryকে যে ভয় করে, আমার মনের গোপনে আমি তার উপরে বিশেষ আস্থা

রাখি না। যারা প্রথম হতেই নেতৃত্ব করতে চায়, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তারা শেষে অতি অপদার্থ প্রতিপন্ন হয়। ব্রাহ্ম যুবকগণ, তোমরা drudgeryতে বিশ্বাস করতে শেখ। মনে মনে বল,—"উঁচু কাজ, নেতৃত্বের কাজ, আধ্যাত্মিক স্তরের কাজ,—এ সকল যাঁদের বিশেষ শক্তি আছে তাঁরা করুন। আমি একটা সামান্য কাজ চেয়ে নিই; তার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে খেটে আমি আগে নির্ভরযোগ্য মানুষ হই; ক্রমে আমারও উঁচু কাজ করবার দিন আসবে।" ব্রাহ্মসমাজের সব কাজই তো পবিত্র কাজ! যদি ব্রাহ্মসমাজ হতে ঝাঁট দেবার কাজে আমার ডাক পড়ে, যদি বেয়ারা হয়ে চিঠিপত্র বিলি করবার কাজে আমার ডাক পড়ে, তা-ও আমি আনন্দের সঙ্গে ও নিষ্ঠার সঙ্গে করব। ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেক drudgeএর দরকার হয়েছে। টাকা তুলবার লোক চাই; আফিসের নানা কাজে খেটে দেবার লোক চাই; নানা বিষয়ে শৃঙ্খলাবিধানের জন্য খাটবার লোক চাই; পত্রিকা দুখানার উন্নতি সাধনের জন্য খাটবার লোক চাই। যুবকগণ, ব্রাহ্মসমাজের ডাক শোন! কে এ সকলের জন্য শুষ্ক খাটুনি খাটতে প্রস্তুত আছ?

অনেক বার তোমরা নবোৎসাহে নানা শাখা প্রশাখাসমন্বিত সুবৃহৎ কার্য্যসূচী (scheme) প্রস্তুত করেছ। তার চেয়ে হাতের কাছের এক একটি কাজ নিয়ে এক এক জন বসে গেলে অনেক ভাল হত। আমি ধূমধাম করে কার্যারম্ভ, প্রকাণ্ড অনুষ্ঠানপত্র, কেবল মস্তক হতে উদ্ভাবিত জটিল কর্ম্মসূচী,—এ সকলে বিশ্বাস করি না। আমাকে দিয়ে ভগবান এ পর্য্যন্ত যত কাজ করিয়েছেন, তার কোনটিতেই আমি ঐ প্রণালীতে চলি নাই। আমি দেখে আসছি, তোমাদের বড় বড় প্রোগ্রামই হয়ে ওঠে তোমাদের কর্ম্মশক্তির কবর। শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্ম-চরিতে পড়ে দেখো, লণ্ডনের একটি Working Men's Instituteএ

তিনি দেখলেন, একটি ভদ্রলোক প্রত্যেক দিন নিজের আফিসের খাটুনির পর সন্ধ্যাকালে Instituteএ গিয়ে শ্রমজীবীদের কাছে সহজ ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এবং এই কাজে তিনি চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে একটি দিনও অনুপস্থিত হন নি। তাঁর কথা স্মরণ করলেও আমার হৃদয় উন্নত হয়। খাটতে দেহে মনে বল পাই। আমি মনে করি, এইরূপে অজ্ঞাত অখ্যাত থেকে, আপনার দেহ মনের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা দান করা, ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপূজা। তোমরা হাত পা দিয়ে, মস্তক দিয়ে, দেহমনের সব শক্তি দিয়ে, এইরূপ পবিত্র drudgeryর কাজ গ্রহণ করবে কি না, ভেবে দেখ! আমি যেন ব্রাহ্মসমাজ-জননীর কাতর আহ্বান শুনতে পাই,—"আমার মজুর চাই, আমার ঝাড়ুদার চাই, আমার গৃহ পরিষ্কার করবার জন্য চাকর চাকরাণী চাই। আমার এত ছেলে মেয়ের মধ্যে কেউ সে কাজে আসবে কি?"

যৌবনের আনন্দ

যৌবনের একটি বড় লক্ষণ, সরসতা ও আনন্দ। যৌবন মানবজীবনের আনন্দের যুগ। যৌবন ভগবানের অপূর্ব্ব দান। যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র কন্যাদের দেখলে আমরা আনন্দ লাভ করি, তাদের বেষ্টনের মধ্যে থাকতে পেলে আমরা আনন্দ লাভ করি। পৃথিবীর প্রত্যেক সুস্থ-হৃদয় বৃদ্ধ আশা করেন ও স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর শেষ বয়সে তিনি তরুণদের দ্বারা বেষ্টিত থাকবেন। দেহ যখন জরাগ্রস্ত, আত্মা তখনও তরুণ থাকতে চায়। তাই সে তরুণদের সঙ্গ চায়; তাদের আশা, উৎসাহ, সতেজ ভাব ও আনন্দের স্পর্শ লাভ করতে চায়। তরুণদের কাজই তো এই, —তারা নিজেরা নিত্য সরস ও নিত্য নবীন থাকবে, এবং মানব-সংসারকে নিত্য সরস ও নিত্য নবীন রাখবে।

কিন্তু যৌবনের এই সরসতা ও এই আনন্দ আস্বাদ করতে ও বিতরণ করতে পারে কে? তরুণ মাত্রেই কি তা পারে? ভোগী ও ভোগ-লোলুপ তরুণেরা কি তা পারে? পারে না। বিধাতা যৌবনকে অবলম্বন করে তরুণদের জীবনে ও তরুণদের চারদিকে তাঁর যত বিমল আনন্দ, তাঁর যত পবিত্র প্রসাদ বিতরণ করতে ও বিস্তার করতে চান; ভোগ-ভিখারীরা তার অতি সামান্য অংশ পায়! সে অমৃতময় প্রসাদ লাভ করতে হলে, এক দিকে তার হাতে হৃদয় মন প্রাণ দেওয়া চাই; তাঁর প্রেমানুভূতিতে প্রাণ মনকে, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলকে মগ্ন করা চাই। অপর দিকে, সংযম আত্মশাসন এবং পরিশ্রমের (discipline এর) দ্বারা আত্মাকে দৃঢ় ও পেশী-বহুল করে তোলা চাই।

আত্মার আবার দৃঢ়তা কি? আত্মার আবার পেশী (muscle) কি? দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার মনের কথাটি স্পষ্ট করতে চেষ্টা করি। রাশীকৃত তুলা পড়ে আছে। তা দিয়ে কিছু বাঁধা যায় না, কোন ভারী বস্তু তোলা যায় না; তাতে এমন কোন শক্তি নাই। কিন্তু তুলার কোমল তন্তুগুলি পাক খেয়ে সূতায় পরিণত হোক, শৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত (carded) হয়ে একটি সূত্রগুচ্ছের আকার ধারণ করুক; তখন তাতে কত শক্তি! মানুষদেহে অঙ্গচালনা না থাকলে আহারের ফলে কেবল মেদ প্রস্তুত হয়। তা ঐ রাশীকৃত তূলার মত; তাতে শক্তি নাই। কিন্তু অঙ্গচালনার ফলে তা যখন সুবিন্যস্ত সূত্রগুচ্ছের মত' পেশীতে পরিণত হয়, তখন তাতে কত শক্তি!

তেমনি হে তরুণ, হে তরুণী, তোমাদের দেহমনে জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের সকল ক্রিয়া, তোমাদের আহরণ-করা সমুদয় জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, তোমাদের সংসারের সব ভালবাসা মায়া-মমতা, তোমাদের

গান গল্প খেলা আমোদ আহ্লাদ,—এ সকলের দ্বারা জীবন-দেবতা তোমাদিগকে শক্তি অর্জ্জনের উপকরণ প্রদান করছেন। এ সকল যেন সেই কোমল তুলা; তোমরা সাধনার দ্বারা তাকে সুদৃঢ় সূত্রগুচ্ছে পরিণত করবে। এ সকল যেন আত্মার অঙ্গে লগ্ন সুকোমল মেদ; তোমরা সাধনার দ্বারা তাকে আত্মার সুদৃঢ় মাংসপেশীতে পরিণত করবে। এ প্রকার সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন দৃঢ় আত্মার কাছেই বিশ্বের সমুদয় অমৃত আস্বাদনের নিমন্ত্রণটী আসে; এবং এ প্রকার সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন দৃঢ় আত্মার কাছেই মানব-সংসার হতে ত্যাগের ও মহৎ আত্মোৎসর্গের আহ্বানটি আসে। আত্মসংযমে অনভ্যস্ত, সুখ-লুব্ধ, দুঃখ-ভীরু, দুর্ব্বল আত্মার কাছে তা আসে না।

যৌবনের আনন্দ কে সম্ভোগ করে? যৌবনের চিরসতেজ চিরসরস চিরনবীন আনন্দ কে আস্বাদন করে এবং কে চারিদিকে বিস্তার করে? যে খুব বেশী বেশী গান গল্প ছবি অভিনয় আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকে? কখনও নয়। করে সে, আত্মশাসনে যার আত্মা মাংসল। করে সে, সংযমে ও শ্রমে যার আত্মা পেশী-বহুল। করে সে, যে প্রেমে খাটে আর খাটতে খাটতে আপনার শ্রম ভুলে গিয়ে হাসতে পারে। করে সে, যে আপনার রক্তমাংসকে, আপনার হৃদয়মনকে সেই পরম প্রেমময়ের প্রেমানুভূতির জন্য প্রস্তুত করছে। এমন তরুণ তরুণীদের দেখে চক্ষু জুড়াতে ইচ্ছা হয়; তাদের দ্বারা বেষ্টিত থেকে জীবন স্নিগ্ধ করতে ইচ্ছা হয়; তাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ একটি ফুলের বাগানের মত হয়ে উঠছে, এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী থেকে যাত্রা করতে ইচ্ছা হয়।

৩রা মাঘ ১৩৩৮

যৌবন ও ধর্ম্মজীবন

সতেজ হৃদয়

যৌবনের একটি বিশেষ লক্ষণ, সতেজ হৃদয়। এই সতেজ হৃদয়ের দ্বারা তরুণেরা সমাজের ধর্ম্মজীবনকে কি ভাবে পুষ্ট করতে পারেন ?—যৌবনে জগৎকে আস্বাদন করবার অনেক নূতন উপায় মানব জীবনে খুলে যায়। স্বয়ং জীবনদাতা যেন যৌবনে জীবনের অনেক নূতন দ্বার খুলে দেন ; ইন্দ্রিয়সকলকে সতেজ করে দেন, দৃষ্টি শ্রুতিকে অধিক অর্থপূর্ণ করে দেন, এবং হৃদয়কে সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে মানুষের সঙ্গকে মানুষের জন্য অধিক অপরিহার্য্য করে তোলেন। ইহা সত্য বটে যে এই সতেজ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে একটা ফেনিল উচ্ছ্বাস আসে, সুখের মত্ততা আসে, জগৎ ভোগের জন্য একটি প্রবল ঝোঁক আসে। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ আত্মাকে তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সেই প্রবল ঝোঁক এবং তজ্জনিত সংগ্রাম একদিন নিরস্ত ও শান্ত হয়; কিন্তু যৌবনে সতেজ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের যে বিকাশ আরম্ভ হয়, তা চিরদিনের জন্যই হয়।

যৌবনে মানুষের হৃদয় বিশেষ ভাবে সতেজ ও সজাগ হয়ে ওঠে বলেই এ সময়ে মানুষ মানুষকে বড় বেশী করে চায়। জগতের স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে তরুণের অন্তর মানুষ-সঙ্গী চায়। নির্জ্জন প্রকৃতির কাছে, নদী পাহাড় আকাশের কাছে গিয়ে সে তার প্রিয় মানুষগুলির সঙ্গ অন্বেষণ করে। অধ্যয়নে, সাহিত্য ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চায়, গানে, খেলায়, কল্যাণকর্ম্মে, সব বিষয়েই যৌবনে মানুষের মন সঙ্গী অন্বেষণ করে।

এর ফলে, এ সময়ে মানব-অন্তরে অধ্যাত্মজীবনের একটি বিশেষ দৃষ্টি খুলে যায়। কারণ, মানবের ধর্মজীবনের একটি বিশেষ ব্যাপার,—সেই পরমসঙ্গীকে নিয়ে জগৎকে দেখা; তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে, নিজের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিলিয়ে নিয়ে জগৎকে দেখা। সেই পরম বন্ধু প্রথম প্রথম মানুষ-বন্ধুকে দিয়ে আমাদের হৃদয়ের এই দিকটিকে বিকশিত করে তোলেন। ভক্ত কবি সেই পরম বন্ধুর বিষয়ে গেয়েছেন, "হের রে অন্তরে অরূপ সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম-বন্ধুরে"।

এজন্য যৌবনই ধর্মবন্ধুতা গঠনের বিশেষ অনুকূল সময়। কিন্তু ধর্মবন্ধুতার প্রধান কথাটি কি? জগতে মিষ্টতা আছে, যৌবনে তার স্বাদগ্রহণের শক্তিটি খুলে যায়, সেই স্বাদগ্রহণে যুবকেরা সঙ্গী খোঁজে,—এ সকল সত্য বটে। কিন্তু শুধু ইহাই কি ধর্মবন্ধুতার ভিত্তি? অথবা, ধর্মরাজ্যে কত বিচিত্র মাধুর্য্য আছে, এবং ধর্মের সেই মিষ্টতা আস্বাদনের জন্য যৌবনে মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়,—শুধু ইহাই কি ধর্মবন্ধুতার ভিত্তি? তা নয়। যৌবনে ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে প্রভুরূপে ও পরম বন্ধুরূপে দেখা দেন। তাঁকে প্রভু বলে বরণ করবার সময় যৌবন। আবার, যৌবনে মানুষকে তার সতেজ প্রবৃত্তিসকলের সম্মুখীন হতে হয়; সে-সকলকে সংযত করবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হয়। এইরূপে তার সম্মুখে ধর্মবন্ধুতার আরও গভীরতর স্তরসকল খুলে যায়। এই তপস্যাই ধর্মবন্ধুতার ভিত্তি। যৌবনের এই আনন্দ ও এই তপস্যা, উভয়ের মিলনে, ধর্মপ্রাণ মানুষের যৌবন জগতে এক অপূর্ব্ব বস্তু; পৃথিবীতে এ শোভার তুলনা নাই। তেমনি, এই আনন্দ ও এই তপস্যা, উভয়ের ভিত্তিতে ধর্মপ্রাণ যুবকদের মধ্যে যে ধর্মবন্ধুতা রচিত হয়, ধর্মরাজ্যের ইতিহাসে তাও এক অপূর্ব্ব বস্তু; সে শোভারও তুলনা নাই।

ধর্মপ্রাণ যুবকের মন বলে, আমার প্রকৃত বন্ধু কে? আমার অন্তরে

মহৎ চরিত্রের যে আদর্শ জেগেছে, সত্যানুসরণের, কর্ত্তব্যপালনের, চিন্তায় কামনায় কল্পনায় আচরণে পবিত্র থাকবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাকে আকুল করেছে, তাতে সহায়রূপে যাঁকে পাই, তিনিই আমার ধর্ম্মবন্ধু। আমার অন্তরে বিবেকের বাণী যখন আমার প্রবল বাসনা-কামনাকুলের কোলাহলে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে, তখন আমার মূর্ত্তিমান বিবেকের মত হয়ে যিনি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন, যিনি এসে দাঁড়ালে আমার অন্তরে বিবেকের সেই ক্ষীণ ধ্বনি সুস্পষ্ট ও সতেজ হয়ে উঠবে, তিনিই আমার ধর্ম্মবন্ধু। সাধন ও তপস্যার দ্বারা তিল তিল করে সমগ্র জীবন ও চরিত্রকে ঈশ্বরানুগত করবার প্রয়াসে যিনি আমার সঙ্গী হবেন, তিনিই আমার ধর্ম্মবন্ধু। ধর্ম্মবন্ধুতা যখন এই ভিত্তিতে দাঁড়ায়, তখন তা পৃথিবীর ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পবিত্রতম দৃশ্য।

ইতিহাসের এই ছবিগুলির দিকে একবার তাকানো যাক। শ্রীঈশার সঙ্গীরা অনেকেই যুবক ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার ব্যাকুলতা,—ইহাই সেই দলটিকে গভীর প্রেমবন্ধনে বেঁধেছিল। শ্রীসিদ্ধার্থের শেষ জীবন পর্য্যন্ত যে শিষ্যগণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই যুবক ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদ পরিণত বয়সে তাঁর ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ করেন বটে; কিন্তু যে ঘননিবিষ্ট দলটি সর্ব্বস্ব ছেড়ে জীবন মরণ পণ করে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁদের সকলেই যুবক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেব যখন তাঁর ভক্তিধর্ম্ম দিয়ে দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তখন তিনি যুবক; তাঁর সঙ্গীরা অধিকাংশই যুবক; যে কয়জন বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁরাও যুবক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন ভালবাসার বন্ধন জন্মেছিল যে পরস্পরকে ক্ষণকালও চোখে না দেখে থাকতে পারতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের ছবিগুলির দিকেও তাকাই। সম্মুখের

আসনে উপবিষ্ট তরুণ যুবা কেশবচন্দ্রের মুখ দেখতে দেখতে দেবেন্দ্রনাথ ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে, আশায় ও উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতেন। যুবা কেশবচন্দ্র ও তাঁর যুবক সঙ্গিগণ পরস্পরকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলে দেখতেন। সে কি গভীর যোগ, কি সুদৃঢ় প্রেমবন্ধন! তখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধনের সূত্র কি ছিল? "বিবেকের আদেশ পালন করবই, যা হয় হোক," এই সঙ্কল্পই ছিল বন্ধনসূত্র। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী-মহাশয়কে ঘিরে সাধনাশ্রমের প্রথম যুগে যে দলটি গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে আমরা অনেকেই যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে কি প্রগাঢ় একপ্রাণতা ছিল, তার বর্ণনা করা অসম্ভব। কিসে আমাদের এমন বাঁধনে বেঁধেছিল? এখানেও সেই উত্তর। "ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জীবন গঠন করব, চরিত্রে স্বভাবে মনের রুচি-অরুচিতে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগত হব," এই এক আকাঙ্ক্ষা, ও তা হতে উত্থিত সহস্র চেষ্টা সংগ্রাম ও তপস্যা,—ইহাই ছিল বন্ধনসূত্র।

যৌবনের এক প্রধান স্বভাব,—সঙ্গী অন্বেষণ। যৌবনের এই স্বভাব যখন গভীর ধর্ম্মবন্ধুতা রচনা করে, তখনই তার চরম সার্থকতা হয়।

নমনীয় প্রকৃতি

যৌবনের দ্বিতীয় একটি বিশেষত্ব এই যে, এ সময়ে মানুষের প্রকৃতি কোমল থাকে। এই কোমলতার দুই ফল; ছাপ গ্রহণ করা ও উচ্ছ্বসিত হওয়া।

ছবি নেওয়া ও ছাপ নেওয়া, এই দুটি ব্যাপার এক নয়। প্রত্যেক দর্শন শ্রবণ, প্রত্যেক কামনা কল্পনা, প্রত্যেক আলাপ পরিচয়, প্রত্যেক আমোদ আহ্লাদ মানুষের মনের উপর কোন না কোন রকমের ছবি

ফেল্‌ছে। অধিকাংশ ছবি ক্ষণকাল পরে মিলিয়ে যায়। কিন্তু যে ছবি স্থায়ী হয়, প্রকৃতির অংশে পরিণত হয়ে যায়, তাকেই বলি 'ছাপ'। শৈশবের অতি তরল প্রকৃতিতে কোনও ছবি সহজে স্থায়ী হয় না; ছাপের আকার ধারণ করে না: শৈশব ছাপ গ্রহণের অনুকূল সময় নয়। বার্দ্ধক্যের পাষাণসম কঠিন প্রকৃতিতে নূতন কোনও রেখা সহজে অঙ্কিতই হয় না; তাই বার্দ্ধক্যও ছাপ গ্রহণের অনুকূল সময় নয়। যুবকের নমনীয় (plastic) মন মোমের মত; ছাপ নিতেও পারে, আবার সে-ছাপ রক্ষা করতেও পারে।

এইজন্য যৌবনে মনের উপর কিসের ছাপ পড়চে, তা সাবধান হয়ে দেখতে হয়। ছাপ তো পড়বেই; কিন্তু তা কি পবিত্রতার ছাপ, মহত্ত্বের ছাপ, না লঘুতার ও মলিনতার ছাপ? উন্নতমনা যুবকের লক্ষণ এই যে, সে তার চারদিককার মানুষের আচরণে আকাঙ্ক্ষায় প্রয়াসে এবং জনসমাজের হাওয়াতে যা কিছু ক্ষুদ্র লঘু বা নীচ দেখতে পায়, তাকে সযত্নে পরিহার করে; যা কিছু মহৎ পবিত্র ও উন্নত, তার ছাপ ব্যাকুল হয়ে তৎক্ষণাৎ আপনাতে গ্রহণ করে, এবং সেই ছাপ সে চিরজীবন আপনাতে রক্ষা করে। মহত্ত্বের ছাপ নিতে সে মোমের মত কোমল, সে-ছাপ রক্ষা করতে সে প্রস্তরের মত দৃঢ়।

একবার রাজা রামমোহন রায়ের কথা চিন্তা করি। তাঁর চারদিকে বাঙ্গালী সমাজের যে অবস্থা ছিল, তা এতই পঙ্কিল যে তা ভাবলেও মন কম্পিত হয়। তার মধ্যে থেকে কি করে তিনি এমন মহামনা মানুষ হলেন? হাঁসের পাখার উপর দিয়ে যেমন জল গড়িয়ে যায়, তেমনি তাঁর মন থেকে সে সব মলিনতা গড়িয়ে চলে যেত। আবার, এদেশ থেকে কিংবা বিদেশ থেকে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার ও মহৎ আচরণের যত সংবাদ তাঁর কাছে আসত, সব তিনি সযত্নে আপনার মনে মুদ্রিত

করে রাখতেন, আত্মস্থ করে নিতেন। তাঁর মত মানুষ হতে হবে। তা হলে এই অতি-বর্ত্তমান যুগের যত পঙ্কিল স্রোত, তার কিছুই যৌবনকে স্পর্শ করবে না; যা কিছু মহৎ তা-ই আত্মাকে পুষ্ট করবে।

যৌবনের এই নমনীয়তা, এই ছাপগ্রহণের শক্তি ভাল থাকে কিসে? শ্রদ্ধা তাজা থাকলে। নষ্ট হয় কিসে?—অশ্রদ্ধার অভ্যাস বা লঘুতার অভ্যাসের দ্বারা মনে কড়া পড়ে গেলে। যৌবনের এই মূল্যবান লক্ষণটিকে সযত্নে রক্ষা করা চাই।

যৌবনের কোমলতার দ্বিতীয় ফল এই যে, তরুণদের মনে সহজেই তরঙ্গ ওঠে, উচ্ছ্বাস আসে। আমি উচ্ছ্বাসের নিন্দা করি না; কারণ, ধর্মরাজ্যে তার খুব সদ্ব্যবহার আছে। যেমন কুচিন্তার ওষুধ সুচিন্তা, তেমনি নিকৃষ্ট উত্তেজনার ওষুধ উন্নত উত্তেজনা। সুস্থ ও সতেজ ধর্ম্মজীবন চাও? নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা হতে মুক্ত থাকতে চাও? হৃদয় মনকে নিরন্তর উচ্চ গ্রামে তুলে রাখতে চাও? তবে, যৌবনের উচ্ছ্বাসপরায়ণতাকে সযত্নে শ্রদ্ধা ভক্তির খাত দিয়ে প্রবল স্রোতের আকারে প্রবাহিত কর। ঠাণ্ডা থেকে, না-মেতে, কেউ কখনও সুস্থ ও উচ্চ ধর্ম্মজীবন পায় না। প্রকৃতির ভিতরে উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা, উচ্ছ্বসিত মহৎ আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ধর্ম্মজীবনে স্বাস্থ্য ও তেজ থাকে না। ডাক্তার এক মিনিট নাড়ীতে আঙ্গুল রেখে বলে দিতে পারেন, শরীর সুস্থ কি অসুস্থ। তেমনি, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত সম্মুখে এলে তোমার মুখখানি কেমন হয়, তোমার আত্মার নাড়ীতে শ্রদ্ধার বেগে রক্ত দ্রুত চলতে থাকে কিনা, তাই দেখে এক মিনিটে বলে দিতে পারা যায় যে তোমার আত্মা সুস্থ কি অসুস্থ।

শাস্ত্রীমহাশয় বলতেন, মানুষের মনে কাম ক্রোধ হবে প্রবল? তারাই করবে অসুরের মত মনের প্রাঙ্গণে লাফালাফি? আর শ্রদ্ধা

ভক্তি ত্যাগ আত্মোৎসর্গ, এরা হবে দুর্ব্বল ? এরা থাকবে নিস্তেজ হয়ে ? না ; তা হলে 'মানুষ' হওয়া হল না। প্রকৃতিকে এমন করে গড়ব যে শ্রদ্ধা ভক্তিই থাকবে প্রবল উচ্ছ্বাসের আকারে ; কামক্রোধই থাকবে তাদের সম্মুখে মাথা নত করে।

আজকাল কেহ কেহ বলেন, "মানব-প্রকৃতিতে যত বৃত্তি আছে, সবই ভাল। পাপ বলে মার্কা-মারা কোনও বৃত্তি নাই। সহজ হও, স্বাভাবিক হও।" এই নব্য তন্ত্রের মত অনেকের কাণে নিশ্চয় এসে পৌঁছেচে। তাদের শাস্ত্রীমহাশয়ের ঐ কথা শোনাতে চাই। জিজ্ঞাসা করতে চাই, "আচ্ছা, মনের প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা ভক্তি নম্রতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, না-হয় কাম ক্রোধ যশোলিপ্সা আমোদপ্রিয়তা, এরাও খেলে বেড়াক। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কে কাকে দমন করে রাখবে ? কে হবে প্রবল, কে হবে দুর্ব্বল ? আমি কি রাগের বেলায় হব অসুর সমান, আর শ্রদ্ধা ভক্তির বেলায় বা কঠিন কর্ত্তব্যসম্পাদনের বেলায় হব দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব মানুষ ?"

যৌবনের সঙ্গলিপ্সার চরম সার্থকতা যেমন প্রগাঢ় ধর্ম্মবন্ধুতায়, যৌবনের নমনীয়তার ও উচ্ছ্বাসপরায়ণতার চরম সার্থকতা তেমনি মহত্ত্বের ছাপ গ্রহণে, শ্রদ্ধা ভক্তির আবেগে।

উদ্যমশীলতা

যৌবনের তৃতীয় একটি লক্ষণ, উদ্যমশীলতা। কিন্তু উদ্যমশীলতার সার্থকতা কেবল বাইরের কাজে নয়। ধর্ম্মসাধনেও এই উদ্যমশীলতার বড়ই প্রয়োজন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্তরে বুঝতে পেরেছি, তাঁর আহ্বান অন্তরে শুনতে পেয়েছি ; তবু কত সময়ে দেখি যে সঙ্কল্পটা শীঘ্র মনে যোগাচ্ছে না, ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সাহসটা শীঘ্র প্রাণে আসচে না। যখন মনের

এইরূপ নিরুদ্যম অবস্থা হয়, তখন কাতর হয়ে প্রার্থনা করি, "দয়াল, আমার ইচ্ছাকে উদ্যত কর; আমার দ্বিধা ঘুচাও; আমার পা চালিয়ে দাও।" উদ্যমশীলতা ছাড়া জীবনে ঈশ্বরানুগত্য সত্য হয়ে ওঠে না। তাঁর ইচ্ছা পালন করব বটে; কিন্তু কেমন ভাবে করব? কোনও-রকমে, কষ্টে-সৃষ্টে, আধখানা-রাজি আধখানা-অরাজি ভাবে করব? মুখখানা ভার করে, শিথিল চরণে, অনিচ্ছুকের মত তাঁর আজ্ঞা পালনে অগ্রসর হব? তা হলে ঈশ্বরানুগত্য সত্য হল না।

ধর্ম্মজীবনে যৌবনের উদ্যমশীলতার ব্যবহার দুই ক্ষেত্রে করা আবশ্যক হয়। প্রথম ক্ষেত্র, অন্তরের প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে সংগ্রামে।

যারা মনে করে, "প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে আবার সংগ্রাম কি? মনে যখন যে-কামনা প্রবল হয়, তখন সেই কামনাই মানুষের নিয়ামক হবে",—তাদের কাছে কিছু বলা নিষ্ফল। কিন্তু যারা দুর্ব্বল, এবং যারা বাসনাকামনাকুলকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত করতে গিয়ে কঠিন সংগ্রামে পতিত, তাদের জন্য আমি কিছু বলতে পারি। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এই সংগ্রামে জয়ী হবার দুটি নিয়ম আছে। প্রথম নিয়ম,—বিলম্ব করো না; তৎক্ষণাৎ রিপুর মস্তকে পদাঘাত কর; বিলম্ব করলেই বিপন্ন হবে। দ্বিতীয় নিয়ম,—রিপুকে আধমরা করে রেখে দেবে না; তাকে নিঃশেষ করবে; নতুবা বিপন্ন হবে।

অন্তরের সংগ্রামে সারা জীবন ধরেই ঈশ্বরের আলোকে আমার প্রয়োজনানুরূপ স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত মন্ত্র রচনা করে নিতাম। যৌবনে এই সংগ্রামে আমার মন্ত্র ছিল "Be prompt and persevere"; এই মন্ত্রটি জপ করে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি।

Be prompt. যদি মনে করা যায় যে, প্রবৃত্তির সঙ্গে কিছু কাল খেলা করে তার পর তাকে জয় করা যাবে, তবে বলি, তা অসম্ভব।

Persevere, হাজার বার পরাজিত হ'লেও এ সংগ্রাম ছাড়বে না। প্রায় সব ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাস এই সংগ্রামের, এই জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ। আমার যৌবনের ইতিহাস এরূপই। আমার সে সময়ের একটি গান আছে,—"তুমি এত কাছে থাক, আমি কেন দূরে যাই"; তাতে নিজের সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম, "সদা পরাজিত, ধূলি-ধূসরিত"। কিন্তু হাজার বার ধূলিতে নিক্ষিপ্ত হ'লেও উঠতে ছাড়বে না। লুটোপুটি খেতে খেতেও সংগ্রাম ছাড়বে না। যদি দেখ যে "অসুর সমান রিপু বলবান" তোমাকে টেনেই নিয়ে চলল, তবু ছাড়বে না। আবার আমার নিজের ছোট বেলার একটি গল্প বলি।

আমার বয়স যখন চার কি পাঁচ বছর, তখন আমি আসামের তেজপুর সহরে ছিলাম। আমাদের অনেকগুলি গরু ছিল। একজন রাখাল সারাদিন সকলের গরু মাঠে চরিয়ে, বিকালবেলা বড় রাস্তা দিয়ে সহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। কালী গাই নামে আমাদের একটা গরু বড় দুষ্ট ছিল; তাকে প্রায়ই চরতে পাঠান হ'ত না। পাঠালে তাকে অন্য কোন গরুর সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে পাঠান হ'ত, যেন পালিয়ে যেতে না পারে। একদিন আমি নিজে উৎসাহ করে রাখালের পাল থেকে আমাদের গরুগুলিকে বাড়ী নিয়ে আসতে গেলাম। সেদিন ঐ কালী গাইটাও ছিল। রাখাল এতটুকু বালকের হাতে কালী গাইর ভার দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু আমি সাহস ক'রে দড়ি ধ'রে তাকে রাখালের হাত থেকে নিলাম। বড় রাস্তা থেকে আমাদের বাড়ীর দিকের ছোট রাস্তায় কয়েক পা অগ্রসর হতেই হঠাৎ সেই দুষ্ট গরু আর এক দিকে চলতে লাগল। আমি কি তাকে টেনে রাখতে পারি? সে আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে এক জঙ্গলে ঢুকল। আমি তার সঙ্গে জোরে পেরে উঠছি না, কিন্তু দড়িও ছাড়ছি না; সেই বনে ভয়

পেয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে ডাকছি, আর কাঁদছি। আমার ডাক শুনতে পেয়েই হোক্ কি আমার বিলম্ব দেখেই হোক্, বাবা এসে পড়লেন ; আমার হাত হতে দড়ি নিজের হাতে নিয়ে আমাকে সেই সংগ্রাম হতে মুক্তি দিলেন।

ছোট বেলার সেই ঘটনাটি ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামে আমি সহস্রবার স্মরণ করেছি ও তাতে বড় বল লাভ করেছি। যদি দেখ যে বাসনার প্রবল শক্তি তোমাকে পরাস্ত করছে, তবু তার দড়ি ছেড়ে দিও না। কাঁদ, আর পিতাকে প্রাণপণে ডাক। তিনিই ঠিক সময়ে তোমাকে মুক্তি দান করবেন !

ধর্ম্মজীবনে যৌবনের উদ্যমশীলতার ব্যবহারের দ্বিতীয় ক্ষেত্র, কঠিন ও অপ্রিয় কর্ত্তব্যে।

আমি ১৯ বৎসর বয়সে সাধনাশ্রমের সঙ্গে মিলিত হই। তারপর হতে কিছুকাল আমার ও আমার সঙ্গী ভাই সুন্দর সিংহ্জীর ধ্যান জ্ঞান এবং নিত্য আলাপের বিষয় কেবল এই ছিল যে, কি-করে ঈশ্বরের আদেশের কাছে ও কর্ত্তব্যের আহ্বানের কাছে ভাল করে আত্মসমর্পণ করা যায়। আমরা সে সময়ে গুরুস্থানীয় পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয় ও ভাই প্রকাশদেবজীর সাহচর্য্য লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছিলাম। অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এই গুরুজনদের আদিষ্ট কর্ম্ম, এ উভয়ই আমাদের মনকে অনুপ্রাণনে পূর্ণ করত। আমাদের আলোচনার ফলে আমি এবার একটি তিন কথার মন্ত্র রচনা করেছিলাম—Promptly, perfectly, cheerfully। এই মন্ত্রটি আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ মণ্ডলীর সকলের মনগুলিকে কি এক অপূর্ব্ব বন্ধনে বেঁধেছিল ! আমাদের ধর্ম্ম-বন্ধুতায় কি এক অপূর্ব্ব গাঢ়তা সঞ্চার করেছিল ! এটি আমাদের মধ্যে একাধারে সঙ্কল্প-মন্ত্র, স্মরণ-মন্ত্র ও আশীর্ব্বাদ-মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একজনের প্রতি খুব কঠিন একটি কাজের আহ্বান এল ; অপর জন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "ভাই মনে রেখো, Promptly, perfectly, cheerfully !" কঠোর শীতে গভীর রাত্রিতে কোথাও যেতে হবে, কিংবা প্লেগের সেবায় দুরন্ত ও বিপজ্জনক পরিশ্রমে নিযুক্ত হতে হবে ; এ অবস্থায় আমাদের এক জনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে ঐ মন্ত্রটি প্রাণের স্পর্শের মতন ছুটে যেত। কত সময় চক্ষের দৃষ্টিতেই পরস্পরকে ঐ কথা বলা হয়ে যেত। কঠিন কর্ত্তব্য ভাল করে সমাপন করে ফিরে এলাম ; গুরুতুল্য ভাই প্রকাশদেবজী স্নেহাশীর্ব্বাদস্বরূপ ঐ বাক্য একবার উচ্চারণ করলেন,—"Promptly, perfectly, cheerfully", আর মন অনুপ্রাণনে ভরে গেল !—এরূপ মন্ত্রের সাধনের দ্বারা জীবনে কত বল পাওয়া যায়, বন্ধুতা কত দৃঢ় ও পবিত্র হয় !

আমার জীবনের আর একটি ছবি, তা ঐ সময়ের নয় দশ বৎসরের পরের ছবি। যিনি উত্তর কালে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে আমার জীবনকে ধন্য করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও প্রণয় সঞ্চারের দিনগুলিতে ঐ ছবি দেখেছিলাম। সেই সময়ে দেখলাম, তিনিও আমাদের ঐ মন্ত্র "Promptly, perfectly, cheerfully" সাদরে অন্তরে ধারণ করেছেন। কঠিন কর্ত্তব্য উপস্থিত হলে, অথবা আমি তাঁকে কোন কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে বললে, তিনি যখন মৃদু স্বরে ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতেন, আমি বুঝতে পারতাম যে এবার তিনিও নিজের মনকে সঙ্কল্প দিয়ে বাঁধ্‌চেন ; তাতে তাঁর প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা কত গভীরতর হ'ত ; এইরূপে আমাদের যৌবনে এই মন্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে ও আমাদের ধর্ম্মবন্ধুতাকে কত পবিত্র ও কত দৃঢ় করেছে !

কাজের ভার দিতে হলে মানুষ নির্ভরযোগ্য কর্ম্মী অন্বেষণ করে।

যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, যা কিছু করা আবশ্যক সবই সে ক'রে আসবে; বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হলেও সে অসমাপ্ত কাজ ফেলে চলে আসবে না; কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে অতর্কিত অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করবে এবং দৃঢ়তার দ্বারা বাধা বিঘ্ন জয় করবে। এমন নির্ভরযোগ্য মানুষকে কাজ দিয়ে কত আনন্দ হয়; এমন নির্ভরযোগ্য মানুষকে কর্ম্মসঙ্গীরূপে বা কর্ম্মীরূপে পেয়ে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে হয়।—এর বিপরীত প্রকৃতির কথা একবার ভাব। যারা বলে, "এত খুঁটিনাটি দেখতে হবে, তা তো আমার আগে জানা ছিল না; এ কাজ আমার দ্বারা হবে না", তারা কি-অশ্রদ্ধেয় মানুষ, কি-অপদার্থ কর্ম্মী! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যুবকেরা অনেকে এমনি আরামপ্রিয়, এমনি নির্ভরের অযোগ্য, কর্ম্মী হিসাবে এমনি অসার হয়ে গড়ে উঠ্‌চে। তাদের দশা দেখে শোক করতে ইচ্ছা হয়; তাদের যুবক বলে স্বীকার করে 'যুবক' কথাটির অপমান করতে ইচ্ছা হয় না। তাদের বয়স যা-ই হোক্‌, তারা জরাগ্রস্ত, তারা জীবনহীন, তারা সমাজের আবর্জ্জনা।

প্রফুল্লতা তরুণ জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। যার পথ কঠিন, কিন্তু হাসি মুখ,—তাকেই বলি ঠিক যুবক! শ্রমের আনন্দ, বাধা বিঘ্ন জয়ের আনন্দ,—এ সকল আনন্দ তরুণ জীবনকে কেমন উজ্জ্বল করে তোলে! বৃদ্ধেরা হয়তো নিজ অভিজ্ঞতার বলে অধিক পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু মানুষের সংসারে প্রফুল্লতায় প্রদীপ্ত যে শ্রম, তার বড়ই প্রয়োজন; সংসার তা যুবকদের কাছেই আশা করে। হাসি মুখে যে কঠিন শ্রম করছে, এমন মানুষকে শুধু একবার দেখে আসবার জন্য আমার দূর দেশে যাওয়াও সার্থক মনে হয়।—ধর্ম্মসমাজে এমন মানুষের প্রয়োজন আরও বেশী। আমাদের ভাবী যুগের কর্ম্মীরা

যদি হাসি মুখে কাজ করেন, যদি সমুদয় তিক্ততা ও সংঘর্ষণ সমাজ থেকে মুছে ফেলে এর কর্ম্মক্ষেত্রকে আনন্দের ক্ষেত্রে পরিণত করেন, তবে কি চমৎকার হয়!

যৌবনের সতেজ হৃদয়কে প্রগাঢ় ধর্ম্মবন্ধুতা-সৃষ্টিতে নিযুক্ত কর। যৌবনের নমনীয়তাকে নিরন্তর মহত্ত্বের ছাপ গ্রহণের দ্বারা, এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রবল উচ্ছ্বাসের দ্বারা সার্থক কর। যৌবনের উদ্যমশীলতার ফলে অন্তরের সংগ্রামে বীর হও, কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে prompt perfect cheerful হও। ব্রাহ্মসমাজ ও দেশ তোমাদের দ্বারা গৌরবান্বিত হোন্।

৭ই মাঘ, ১৩৪০

সুখ দুঃখ শ্রম ও প্রেম

এ দেশে প্রাচীন কালে বলা হ'ত, মানুষ সাধারণতঃ চার প্রকার লক্ষ্যের বা 'পুরুষার্থের' জন্ত জীবিত থাকে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ত্তমান কালে সংসারের মানুষ সাধারণতঃ কিসের কিসের জন্ত জীবিত থাকে, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখা যাবে যে প্রাচীন ও আধুনিক উত্তরে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ মনে করে, মানব-জীবন কেবল সুখভোগের জন্ত ; এই সুখভোগের আদর্শটি প্রাচীন 'অর্থ' ও 'কাম' উভয়ের সদৃশ। কেউ বা বেঁচে থাকার সার্থকতা কেবল এইটুকু দেখে যে, কোন রকমে দুঃখ এড়ান যায় কি ক'রে। এটি 'মোক্ষের' সঙ্গে সদৃশ ; কারণ প্রাচীন কালে "মোক্ষ' শব্দের অর্থ ছিল জন্ম হতে ও জন্মহেতুক দুঃখ হতে নিষ্কৃতি। কেউ বা মানবজীবনকে কর্ম্মশালা অর্থাৎ কর্ম্ম শিখবার drill-yard ও কর্ম্ম করবার কারখানার মত ভাবেন। এটি 'ধর্ম্মের' সঙ্গে মেলে ; কারণ প্রাচীন কালে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ ছিল, মানবের কর্ত্তব্যসমষ্টি।

মানবজীবন সম্বন্ধে এ সকল ছাড়া আরও এক প্রকার দৃষ্টি আছে, তা-ই শ্রেষ্ঠ। তা এই যে, মানবজীবন ঈশ্বরের ও মানুষের প্রেমের ক্ষেত্র।

ভোগবাদ

প্রথম মনোভাবটির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বিগত য়ুরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) পর কিছু কাল পাশ্চাত্য

জগতে এই এক রব সর্ব্বত্র শোনা যেত যে, জগৎ থেকে ও মানবজীবন থেকে যথাসম্ভব সুখ আদায় করে নাও; জীবন হতে সুখ আদায় না হলে জীবনই বৃথা। সার্থক ভাবে বেঁচে থাকবার মাপকাঠিই হল সুখভোগ। সে সময়ে সাময়িক সাহিত্যে নূতন একরূপ ভাষার সৃষ্টি হল। যে-মানুষ অসুখের জন্য বা অন্য কোনও কারণে জীবনের সুখগুলি সতেজে ভোগ করতে পারছে না, সে বলে, "I do not live; I simply exist,"—অর্থাৎ "আমি জীবিত আছি, এ কথা বলা চলে না; আমি কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করছি মাত্র।" 'জীবিত থাকা' অর্থই হল জীবন ভোগ করা।

এই চিন্তাধারা হতে প্রসূত আর একটি চিন্তা,—বলতে গেলে এই চিন্তারই একটি উপপত্তি (corollary), এইরূপ,—ভোগায়তন মানবদেহে যৌবনই একমাত্র গণনাযোগ্য কাল, কারণ, যৌবনেই সর্ব্বাপেক্ষা সতেজে জীবনের সুখ সম্ভোগ করা সম্ভব হয়। বাল্য কেবল যৌবনের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি মাত্র। যৌবনের জন্য অপেক্ষা করা, যৌবনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকা, যৌবনের জন্য প্রস্তুতি,—ইহাই বাল্য ও কৈশোরের মূল্য। কোরকটি যেমন পুষ্পের পক্ষে প্রস্তুতি মাত্র, শৈশবও তেমনি যৌবনের জন্য প্রস্তুতি মাত্র।

রূপক সুপ্রযুক্ত না হলে তা বিপজ্জনক হয়; তা চিত্তকে বিভ্রান্ত করে। জড় পুষ্প সম্বন্ধে, জড় দেহ সম্বন্ধে, এটা সত্য বটে যে কোরকটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের জন্য প্রস্তুতির অবস্থা মাত্র। কিন্তু দেহ ও আত্মা তো এক নয়! আত্মার জীবনের প্রত্যেক অবস্থারই একটি পূর্ণতা আছে। রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন; বলেছেন, "অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ,

সেও সুন্দর।” এই দৃষ্টান্তের মর্ম্ম এই যে, মানবজীবনের প্রত্যেক বয়সেরই একটি পূর্ণতা, একটি সার্থকতা আছে।

বাল্যের সার্থকতা কি? এ বিষয়ে আমরা এত দিন ধর্ম্মের এই বাণী শ্রবণ করেছি যে, মানবাত্মার পক্ষে বাল্যকাল নির্ভর ও আনুগত্য শিক্ষা করবার সময়। পিতামাতার ও গুরুজনের আনুগত্য ও তাঁদের উপরে নির্ভর,—বাল্যে শিক্ষিত এ সকল ভাব শুধু বাল্যের জন্যই নয়। এ সকল ভাব আমাদের সারাজীবনের সম্বল। ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজ ইচ্ছা দ্বারা পূর্ণভাবে পালন করা, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে নিজ ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর উপরে পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করা,—ধর্ম্মজীবনের এ সকল স্থায়ী ভাবের ভিত্তি বাল্যেই গ্রথিত করতে হয়। ধর্ম্মপ্রাণ অশীতিপর বৃদ্ধেরও অন্তরে এ গূঢ় শিক্ষাটি জাগরিত থাকে যে, বাল্যে তাঁর অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি যে-নির্ভরের ভাব ও যে আপত্তিবিহীন নিরুত্তর বাধ্যতার ভাবটি ছিল, তা যেন তাঁর প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

বাল্যের এই পবিত্র শিক্ষাকে অবজ্ঞা ক'রে যারা অনাগত যৌবনের সুখ ভোগের জন্য প্রতীক্ষার ভাবকে বাল্যে ও কৈশোরেই মানব-প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট (inject) করে দিতে চায়, তারা ধর্ম্মের মহাশত্রু।

বাল্য যেমন অসম্পূর্ণ যৌবন নয়, পরিণত বয়সও তেমনি যৌবনের ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা নয়। পূর্ব্বোক্ত ভোগবাদী মানুষদের দৃষ্টিতে বার্দ্ধক্যের আগমন মানবজীবনে একটি বড়ই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা; কারণ, বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগের শক্তি হ্রাস হয়। ঔষধ সেবনের দ্বারা, ইন্‌জেকশনের দ্বারা, বানরের গ্রন্থি সংযোজনের দ্বারা এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে যৌবনের অর্থাৎ সুখ ভোগের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি কর,—এটাই এদের বুলি। বাল্যকালে

জ্যামিতিতে পড়েছিলাম, সরল রেখাকে উভয় দিকে যথেচ্ছ বর্দ্ধিত করা সম্ভব। এরা যেন চায় যে যৌবনকে অতীত ও ভবিষ্যৎ, বাল্য ও বার্দ্ধক্য, উভয় দিকে যথেচ্ছ বর্দ্ধিত করে নেবে।

আমরা কি মানবসমাজে মানুষের প্রৌঢ় বয়সকে একটা ক্ষয়শীল, হ্রসমান (decadent) ও শোচনীয় অবস্থা বলে ভাবব? কখনও নয়! দেহ-জীবনের পক্ষে তা সত্য হতে পারে, কিন্তু আত্মার জীবনে পরিণত বয়সের একটি বিশেষ ও অতি পবিত্র মূল্য আছে।

মানব-সংসারে সংগ্রাম-অতিক্রান্ত শান্ত জীবনের বড়ই প্রয়োজন। যে শ্রেণীর অনেক মানুষ মানবসমাজে না থাকলে বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, শোকের অন্ধকারে দৃষ্টিহীন, প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত মানুষকে অভয় ও ভরসা দান করবে কে? তরঙ্গ-তুফানে পতিত জাহাজের আরোহীর পক্ষে অভিজ্ঞ পোতাধ্যক্ষের যে প্রয়োজন, প্রবল শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত সৈনিকের পক্ষে বহুযুদ্ধজয়ী প্রবীণ সেনাপতির যে প্রয়োজন,—শোক তাপ ও মোহময় মানব-সংসারে প্রৌঢ়-বয়স্ক, শান্ত, উদ্দামপ্রবৃত্তিকুলের-সংগ্রামে-বিজয়ী মানুষেরও সেইরূপ প্রয়োজন।

আমার যৌবন কালে, আমি যখন প্রবৃত্তিকুলের সঙ্গে সংগ্রামে অবসন্ন ও ক্ষতবিক্ষত, তখন একবার বুদ্ধ-গয়ার মন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করতে গিয়েছিলাম। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত সেই বিশাল মূর্ত্তি ও তার আনত ঈষদুন্মীলিত করুণাপূর্ণ চক্ষের দৃষ্টি আমার শরীর ও মনকে শান্তিরসে পূর্ণ করতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, ঐ পাষাণ-শীতল বক্ষের আলিঙ্গন লাভ করলে আমার প্রবৃত্তি-তাপে দগ্ধ দেহ মন হয়তো শীতল হবে। বহু কষ্টে সে দিন আমি আমার ভাবাবেগ রোধ করেছিলাম।

কিন্তু তার পরে এই দীর্ঘ জীবনে মানুষের আত্মিক পরিচর্য্যার বহু অভিজ্ঞতার পর, এখন আমি এ-কথা বলি যে, মানবসমাজে এমন সকল পরিণত-বয়স্ক মানুষ,—পাষাণ মূর্ত্তি নয়, রক্তমাংসময় মানুষ—থাকা প্রয়োজন, যাঁরা বুদ্ধের ন্যায় 'শমিত-ভব-তাপ',—প্রবৃত্তি-সংগ্রামে তপ্ত কোনও তরুণকে যাঁরা নিজ সুশীতল বক্ষে জড়িয়ে নিয়ে স্নেহের ও অভয়ের স্বরে বলতে পারেন, "বৎস, ভয় ক'রো না! আমরা এরূপ সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। তুমিও এক দিন জয়ী হবে।"

এখন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য বিষয়ে আলোচনা ছেড়ে দিয়ে প্রথম মনোভাবটির মূল বিষয়ে আবার একটু চিন্তা করা যাক। মানব-জীবনে সুখের কি কোন মূল্য নাই? নিশ্চয়ই আছে। সুখের শ্রেষ্ঠতম মূল্য এই যে, সুখ প্রেমসম্বন্ধকে দৃঢ় করে। ভালবাসাকে সাহায্য করে,—এই টুকুই ভাল লাগার মূল্য। কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখ এই কাজটি আরও ভাল ক'রে করে। সংসারে পরস্পরের জন্য দুঃখবহনের অধিকার না থাকলে আমাদের স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির চর্চ্চা কেমন করে হ'ত? সে সকল কেমন করে ফুটত?

দুঃখবাদ

এখন দ্বিতীয় মনোভাবটির কথা চিন্তা করা যাক। এ দেশে তাকে দুঃখবাদ বলা হয়। এই মনোভাব সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি মাত্র কথা আমি বলব; কারণ সকলেই এ চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ "জগৎ দুঃখময়" এই চিন্তার তাড়নাতেই গৃহত্যাগ করেন; এবং তিনি গৃহত্যাগ করবার সময় আকাশে এই বাণী গীত হচ্ছিল,—"জলিতং ত্রিভবং জরা-ব্যাধি-দুঃখৈ র্মরণাগ্নি-প্রদীপ্ত মনাথ মিদম্।"

এই চিন্তাটিকে কখনো কখনো আর এক আকার দান করা হয়।

তা এই যে, জগৎ একটি কারাগার। রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন,—
"তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে পুরিলি, বল্ !"

প্রশ্ন এই, এই চিন্তাধারাকে কি ধর্মভাব বা ধর্মচিন্তা বলে গৌরব দান করা উচিত? আমার তো মনে হয় না। জগতের দুঃখের কথা ক্রমাগত চিন্তা (চিন্তা মাত্র) করে করে চিত্তে এক প্রকার ভাবুকতা জন্মে। তাকেই কেহ কেহ ধর্মভাব বলে মনে করেন। জগতের দুঃখের কথা চিন্তা ক'রে তার প্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হবার নিশ্চয়ই মূল্য আছে। কর্মরাজ্যেও তার মূল্য আছে, মানবের চরিত্রেও তার মূল্য আছে। কিন্তু তা না করে যদি জগতের দুঃখচিন্তার দ্বারা মনকে শুধু জগৎ সম্বন্ধে উদাস করে তুলি, যদি শুধু মনে এক রকম কাঁদো-কাঁদো ভাব সৃষ্টি করি, তবে তার কোন মূল্য নাই। 'মূল্য নাই' বললে কম বলা হ'ল ; এরূপ করা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

যা হোক, ইহা ভোগবাদ অপেক্ষা এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ; ইহা মনের ক্ষেত্রে ভাল বীজ রোপণ করতে পারে না বটে, কিন্তু মনের আগাছা বাড়তে দেয় না।

কর্মশালার শিক্ষা-প্রাঙ্গণ

সংসার ও মানবজীবন সম্বন্ধে তৃতীয় এক প্রকার মনোভাব এই যে, সংসার কর্মশালা এবং মানবজীবন কর্মশালার শিক্ষা-প্রাঙ্গণ স্বরূপ। সৈনিকদের শিক্ষা-প্রাঙ্গণে (drill-yardএ) যেমন প্রতিদিন একরূপ অঙ্গচালনা করিয়ে করিয়ে মানুষটিকে যুদ্ধ বিদ্যাও শিখানো হয়, আবার কষ্টসহিষ্ণু হতে এবং সুখ দুঃখ প্রকাশের অভ্যাস রোধ করতেও শিক্ষা দেওয়া হয় ; মানবজীবনকে সেই চক্ষে দেখ। তোমার জীবনের ঘটনা ও অবস্থা সকলকে, ঘাত প্রতিঘাত সকলকে, অতর্কিত ব্যাপার সকলকে,

সুখ-দুঃখকে, হাসি-কান্নাকে অগ্রাহ্য করেই চল। সব রকম অবস্থার ভিতরে কেবল নিজ কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রেখে খেটে যাও। এই শিক্ষাটি ভারতে বর্ণাশ্রমবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের দ্বারা সঞ্চার করা হ'ত। মানুষের 'আশ্রম' অর্থাৎ বয়স-জনিত অবস্থা, এবং তার 'বর্ণ' অর্থাৎ জাতি, তার জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করে দিত। সেই নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কর্ম্ম মানুষটির কাছ থেকে আদায় করতেই হবে। তার সুখ-দুঃখ, তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা,—এ সকল সেই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সম্মুখে গণনার যোগ্যই নয়।

ব্রাহ্মসমাজের জন্ম সময় হতে বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটি বিশাল পরিবারের তিনি অন্নদাতা; তথাপি সেই পরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তাঁর কোন হাত ছিল না। উপার্জ্জক হ'লে কার না স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় যে নিজের পত্নী ও পুত্রকন্যাগণকে নিয়ে একটু নিভৃত পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করি? কিন্তু তিনি তার সুযোগ একেবারেই পান নাই। তাঁর জীবনচরিত পাঠ করলে পাঠকের মনে পর্য্যন্ত এজন্য ক্ষোভের উদয় হয়। তাঁর নিজের তবে কত ক্লেশ হয়ে থাকবে!

প্রাচীন ভারতে জনসমাজের কর্ত্তব্যে (public dutyতে) মানুষদের কি শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তার পরিচায়ক কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্যগ্রন্থাদি নাই। কিন্তু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠে শুধু কর্ত্তব্যের দিকে মন দিতে মানুষকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তার সহস্র সহস্র পরিচয় ও দৃষ্টান্ত পৌরাণিক গ্রন্থে এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। এই শিক্ষাই ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব-প্রকৃতির মেরুদণ্ড গড়ে দিত।

ইংলণ্ডে (অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির মেরুদণ্ড গড়ে দিত সাধারণের সমক্ষে কৃত কর্ত্তব্যের (public dutyর) দৈনন্দিন শিক্ষা ও সাধনা। নেল্‌সনের নৌ-সেনাগণ ছিল জনসমাজের নিম্নতম স্তর হতে সংগৃহীত। কিন্তু তারাও নেল্‌সনের এই সঙ্কেত-বাণীটি লাভ করে অগ্নিময় হয়ে উঠল,—"ইংলণ্ড আশা করেন যে অদ্য প্রত্যেকটি মানুষ তার কর্ত্তব্য (duty) সমুচিত ভাবে সম্পন্ন করবে।" আপাততঃ মনে হতে পারে যে এই বাণীতে তেমন উন্মাদনা কই? এ তো অতি সাধারণ বাণী! কিন্তু তা নয়। ইংলণ্ডের লোকদের দৈনন্দিন শিক্ষার ফল এই দাঁড়িয়ে গেছে যে তারা public dutyর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে চীনে যখন সাম্রাজ্য ছিল, তখন একবার য়ুরোপীয় বহু রাষ্ট্রের সৈন্যের শিবির সে দেশে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এক দিন শত্রুসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণের ফলে এক জন ইংরেজ নাবিক ও কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক চীনদের কাছে বন্দী হয়। শত্রু-সেনাপতি যখন বন্দীদিগকে তাঁহার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করতে আদেশ করলেন, তখন সেই এক জন ইংরেজ নাবিকের ও অপর দিকে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈনিকের ব্যবহারের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা গেল। ইংরেজ নাবিকটি ভারতীয় সৈনিকদের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করতে বা প্রাণ ভিক্ষা করতে সম্মত হল না। পাঠ্য পুস্তকে ইংরেজী পদ্যে এই ঘটনাটি বর্ণিত ছিল। লেখক বলেছেন, সেই ইংরেজ নাবিক অতি নিম্ন স্তরের মানুষ। কাল রাত্রে সে বন্ধুদের সঙ্গে মাতলামি ও মারামারি করেছে; কিন্তু আজ যখন স্বদেশের গৌরব রক্ষার মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখন সে জানে তাকে প্রাণ দিতেই হবে, (the English lad must die)।

এই তেজ কিসে হয়? কেবল কি স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাতে হয়? কখনও হয় না। মানব অন্তরের কোনও ভাব বা কোনও আদর্শ যতই উন্নত ও যতই মহৎ হোক না কেন, শুধু তার বলে মানবচরিত্রে এই দৃঢ়তা জন্মে না। এর জন্য চাই drill—প্রতিদিন ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের-প্রতি-দৃষ্টিহীন নির্মম নিষ্করুণ আত্মশাসন, প্রতিদিন অকুণ্ঠিত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষার ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের অভ্যাস। এই জন্যই সৈনিকদিগকে প্রতিদিন এত কষ্ট দিয়ে drill করানো হয়।

উন্নত 'আদর্শ' তো প্রথমতঃ থাকে চিন্তায় ও ভাবে। তা চরিত্রগত ও জীবনগত হয় কিসে? আরও চিন্তায়? গভীর মননে? প্রবলতর ভাবের উদ্দীপনায়? না; এর কোনটিতে তা হয় না। উন্নত আদর্শকে জীবনগত করতে হলে দীর্ঘ কঠোর তপস্যার, দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন।

শাসন অনুবর্ত্তন, কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে সমাপন, সময়ে নিষ্ঠা, অকুণ্ঠিত পরিশ্রম প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মচারী হিসাবে দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বলে গণিত হয়, তার কোনটিই শুধু আদর্শ নিয়ে মাতলে আয়ত্ত হয় না। তার জন্য চাই অধ্যবসায়-সম্পন্ন সংযম-সমন্বিত দীর্ঘ সাধনা। ইংরেজ-সমাজে বাল্য বয়সে. বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে ও drill yardএ, এবং বয়স্ক জীবনে অফিসের সৈনিকোচিত নিয়মানুগত্যে (garrison-like disciplineএ) চরিত্রে এ ভাবটি সঞ্চারিত হয়।

এ দেশে পারিবারিক কর্ত্তব্যে ঐরূপ সুনির্দ্দিষ্ট কঠোর নিয়মানুগত্য (drill) ছিল। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তুচ্ছ; পুরুষ ও নারীর আকর্ষণ তুচ্ছ; মনোজীবনের আলো-ছায়া তুচ্ছ;—সমগ্র পরিবারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই প্রধান। এই ভাব ভারতীয় মানব-প্রকৃতিতে দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্ব

সঞ্চার করত—যদিও তা পাশ্চাত্য জগতের public dutyর মনুষ্যত্ব হতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

: ব্রাহ্মদের ধর্ম্মজীবনের ও কর্ম্মজীবনের প্রধান দুর্ব্বলতা কোথায়? এই drillএর অভাবে। আমাদের ধর্ম্মজীবনে নবযুগের উপযোগী মার্জ্জিত চিন্তার ও ভাবের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। এই দুই বিষয়ে ভারতের নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম স্থান নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতার মূল এই যে, আমাদের এমন একটিও ধর্ম্মশিক্ষালয় অথবা ধর্ম্মমণ্ডলী নাই, যেখানে মানুষকে প্রতিদিনের শাসনের ও আত্মশাসনের চাপে ফেলে মানুষ করে দেওয়া হয়; যেখানে নবাগত কোনও মানুষকে কোনও একটি ধর্ম্মসাধন দীর্ঘ কয়েক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ধরে থাকতে বাধ্য করা হয়। তার ফল এই হয়েছে যে আমরা ভাবুকতায় ও তত্ত্বচিন্তায় ভারতে অগ্রগণ্য; কিন্তু চরিত্রে, কর্ত্তব্যে ও নির্ভর-যোগ্যতায় অন্যান্য স্বদেশবাসীর ন্যায়ই নগণ্য।

"মানবজীবনকে কর্ম্মভূমি (drill yard) বলে দেখ"—এই তৃতীয় মনোভাবটি মানুষকে পূর্ণ ধর্ম্মজীবনের পদবীতে নিয়ে যায় না বটে, কিন্তু ইহা যে ধর্ম্মজীবনের পরম সহায়, তাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা যে সারবান চরিত্র জন্মে, তা-ই প্রকৃত প্রেমভক্তির জীবনের ভিত্তি।

প্রেমনিকেতন

: সেই সারবান জীবনেই প্রেমজীবনের ভিত্তি গঠিত হতে পারে। প্রেমজীবনে কি দুঃখ থাকে না? প্রেমিকের জীবনে কি এমন অবস্থা সকল আসে না, যাতে জগৎকে দুঃখের আগার বলতে বা কারাগার

বলতে পারা যায়?—আসে বই কি? কিন্তু প্রেমিক তাকে গণনার মধ্যে আনেন না।

আচার্য্য শিবনাথ একটি দৃষ্টান্ত বড় ভালবাসতেন। জীবনের দুঃখ ও জীবনের শুষ্ক শ্রম (grind) কেমন করে মিষ্ট হয়ে যায়, মন হৃদয় ও ইচ্ছা কেমন করে সহজে উন্নত ও মধুময় হয়ে উঠে, তা বুঝবার পক্ষে এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

আবু সোফিয়ান নামে মহম্মদের এক পরাক্রান্ত শত্রু যুদ্ধে মহম্মদকে বন্দী করবার ও বধ করবার বিষয়ে এত অধিক নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনিই পরাস্ত হলেন এবং তাঁর কন্যা মহম্মদের সৈন্যগণের হস্তে বন্দিনী হলেন। মহম্মদ তাঁর প্রতি রাজকন্যোচিত সম্মানের সহিত ব্যবহার করতে সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেই কন্যা আপনাকে কারার বন্দিনী জেনে অতিশয় দুঃখে ও ক্ষোভে নিমগ্ন হলেন; মহম্মদ দর্শনপ্রার্থী হলেও তাঁকে দর্শন দিলেন না।

ক্রমশঃ মহম্মদের অক্ষুণ্ণ সৌজন্য তাঁর চিত্ত জয় করল। তিনি মহম্মদকে প্রথমতঃ নিকটে আসতে দিলেন; ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন; ক্রমে তিনি মহম্মদের গুণের এমন অনুরাগিণী হলেন যে তাঁকে বিবাহ করলেন।

বিবাহের এক বৎসর পরে আবু সোফিয়ান সন্ধিপ্রার্থী হয়ে কন্যার ভবনে আগমন করলেন। মহম্মদের চরণে যখন অনেক রাজা ও সম্রাটের মস্তক অবলুণ্ঠিত হ'ত, তখনও তিনি ফকীরের মতই থাকতেন। মহম্মদের ঘরে একটি মাদুর বই শয্যা কিংবা আসন কিছুই থাকত না। সেই মাদুরে বসতে উদ্যত আবু সোফিয়ানকে তাঁর কন্যা এই বলে নিবৃত্ত করলেন,

"ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনের আসনে বসো না; আমি তোমাকে অন্ত আসন দিচ্ছি।" কি ঘোর পরিবর্ত্তন!

রামপ্রসাদ সেন গেয়েছিলেন, সংসারটা কারাগার; সেটা ছিল রূপক। এই কন্যার পক্ষে সত্য সত্যই কারার বন্দিনী হবার জীবন উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে যদি বিবাহের পরে কেহ বলত, "তুমি তো এখনও শত্রু-শিবিরে এবং কারাগারেই রয়েছ", তবে তিনি কি সে কথার উত্তর দিতেন? খণ্ডন করতেন?—বোধ হয় কোন উত্তরই দিতেন না!

সংসার কি বন্দীশালা নয়? জগতে কি দুঃখ নাই?—প্রেম এ সকল প্রশ্নে একান্ত উদাসীন। প্রেমের উত্তর এই,—"তোমার ও-বিজ্ঞতা তোমারই থাক! আমার জেনে কাজ নেই; বিচার করে কাজ নেই। আমি মেনেই নিচ্ছি যে আমি প্রভুর প্রেমে বন্দিনী। আমি এতেই সুখী!"

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ (১৩৪৬)

ব্রাহ্মসমাজ ও ভাবী যুগ

তরুণদের মধ্যে অনেকে ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজের স্বরূপ আকার ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে চিন্তা করছেন। এই সুবিশাল বিষয়ের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে মাত্র কয়েকটির সম্বন্ধে ভাবী যুগের দিকে দৃষ্টি রেখে কোন কোন পুরাতন কথাকেই নূতন ভাবে জোর (emphasis) দিয়ে বলা প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজের ভাবী স্বরূপ ও আকার সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের বাণী হতে আমরা অনেক ইঙ্গিত পাই। সেগুলির দিকে সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিপাত করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব ভারতের ও সর্ব্ব জগতের জন্য

রামমোহন রায় বলেছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব ভারতের জন্য; শুধু সর্ব্ব ভারতের নয়, সর্ব্ব জগতের জন্য। অথচ, রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ ধীরে ধীরে বিশিষ্ট মত ও বিশিষ্ট সমাজরীতি-সম্পন্ন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে তরুণদের মধ্যে কখনও কখনও এই প্রশ্ন উত্থিত হতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় হয়ে জীবিত থাকবার প্রয়োজন ছিল কি না, ও আছে কি না?

আমার বিশ্বাস, সম্প্রদায়ের আত্মবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক উদারতা,— মানব-মনের এই উভয় ভাবের সামঞ্জস্য করা সম্ভব; ব্রাহ্মসমাজে এ

সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে ; এবং এই সামঞ্জস্যবিধান ধর্ম্মজগতে ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্ব ভারতের ও সর্ব্ব জগতের,—স্বয়ং রামমোহন এ কথা বলে গিয়েছিলেন। একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমণ্ডলী হয়েও যে আমরা সর্ব্ব ভারতের ও সর্ব্ব জগতের মিলনসূত্র-স্বরূপ হতে পারি, এটুকু এ যুগে আমাদের বলতে হবে এবং করে দেখাতে হবে।

ব্রাহ্মসম্প্রদায় গঠন কি ভুল হয়েছে ?

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আকার ধারণ করা ভুল হয়েছে কি না, এ প্রশ্নের আলোচনা সংক্ষেপে একবার করা যাক্। আমার মতে, ইহা ভুল হওয়া দূরে থাকুক, এইরূপ একটি বিশিষ্ট মণ্ডলীর আকার ধারণ না করলে ব্রাহ্মসমাজ নিজ জীবনকে এত দিন রক্ষা করতেই পারতেন না। স্বাস্থ্যের জন্য মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ; কিন্তু সে জন্য কেউ এ কথা বলে না যে ঘরের দেয়াল ও ছাদ রেখো না, আকাশের নীচে মুক্ত বায়ুতেই নিত্য বাস কর। দেয়াল বা ছাদ না থাকলে ঘর ঘরই হয় না। ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি আত্মার বাড়ী থাকা আবশ্যক। একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমণ্ডলীর অঙ্গীভূত হয়ে জীবিত না থাকলে আমাদের ধর্ম্মসাধনে শিথিলতা ও অস্পষ্টতা প্রবেশ করা অনিবার্য্য।

ঈশ্বর মানুষকে মানুষের সহায় হবার জন্য নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলী ভিন্ন মানুষেরা পরস্পরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় সহায়তা—অর্থাৎ ধর্ম্মের সহায়তা—দান করতে পারে না। যদি সমগ্র ধর্ম্মমণ্ডলীর সঙ্গে তার অঙ্গীভূত কোন একটি পরিবারের যোগ একটু শিথিল হতে থাকে, যদি কোন ব্রাহ্ম পরিবার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে জীবন্ত যোগ রক্ষা না করেন,—তবে সেই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের প্রতি নিজ

নিজ কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্যক্ রূপে পালন করতে পারবেন না। ধর্ম্মমণ্ডলী যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মজীবনের আশ্রয়, তেমনি পরিবার-গুলির কল্যাণেরও সুদৃঢ় আশ্রয়।

মণ্ডলীর প্রয়োজনকে আর এক দিক থেকে দেখা যায়। প্রীতিই মানবজগতে প্রবলতম বন্ধনশক্তি। ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ নিয়ে পরিবার রচনা না করতেন এবং পরস্পরের সঙ্গে নানা প্রীতিসম্বন্ধে ও নানা রক্তসম্বন্ধে আবদ্ধ একটি মণ্ডলী গঠন না করতেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ একটি নির্জ্জীব ধর্ম্মচর্চ্চার কেন্দ্র বা সাধনগোষ্ঠীর আকারে অল্প কাল মাত্র জীবিত থাকতেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত 'ব্রহ্ম-চক্র' এইরূপ একটি সাধনগোষ্ঠী ছিল; কিন্তু এখন তার কোনও চিহ্ন নাই। ব্রাহ্মসমাজ যে ভারতে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত, এর ইতিহাসকে যে ভারতের ইতিহাস থেকে কেউ কখনও মুছে ফেলতে পারে না, তার কারণ এই মণ্ডলীবন্ধন।

সর্ব্বজনীন উপাসনা ও মিলন-বাণী

এখন মণ্ডলী বন্ধনের প্রয়োজনীয়তার কথা ছেড়ে দিয়ে রামমোহন রায়ের আদর্শ বিষয়ে চিন্তা করা যাক। রামমোহন তাঁর ট্রষ্ট-ডীডে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁর ব্রাহ্মসমাজ কেবল হিন্দুদের জন্য নয়; তা' সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য। সকল ধর্ম্মাবলম্বী মানুষেরাই যে এক মন্দিরে একত্র হয়ে পরমেশ্বরের উপাসনা করতে পারে, এ কথা সে যুগের অন্য লোকেরা অসম্ভব বলে মনে করতেন। রামমোহন ইহা শুধু সম্ভব বলেই মনে করলেন না; ইহা বাঞ্ছনীয় বলে এবং সর্ব্ব জগতের কল্যাণের জন্য এবং শান্তির জন্য অপরিহার্য্য বলে অনুভব করলেন।

নিরাকার একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনাতে তিনটি ধাপ বা স্তর কল্পনা করা যেতে পারে। (১) তাঁর ব্যক্তিগত উপাসনা, যেমন প্রাচীন

ব্রহ্মবাদিগণ করতেন। (২) সমবিশ্বাসীদের নিয়ে উপাসনা, যা খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ করেন, এবং যা আমরা আজকাল করছি। (৩) সর্ব্বজনীন উপাসনা, যা রামমোহনের মানস-ছবিতে ছিল। ইহা সত্য বটে যে, রামমোহন রায় দ্বিতীয় স্তরের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উর্দ্ধে, তৃতীয় স্তরে গিয়ে পৌছেছিল। "আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বজনীন"—এ কথা বলবার এবং শুনবার সময় ভাবাবেগে রামমোহনের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'ত।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে আমরা দ্বিতীয় স্তরে রয়েছি। আমরা নিজেরাও একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। আবার, আমাদের চারিদিকে প্রাচীন ও নবীন অন্যান্য বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দণ্ডায়মান। এর ভিতরে রামমোহনের অনুবর্ত্তী হওয়াতে আমাদের এই বিশেষ দায়িত্ব হয়েছে যে, সম্প্রদায় গঠনের প্রকৃত প্রয়োজন কি, তা আমরা কখনও বিস্মৃত হতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অপরের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যকে তীক্ষ্ণতর করে তোলবার জন্য নয়। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন কেবল ধর্ম্মসাধনে দৃঢ়তার জন্য, কেবল ধর্ম্মমূলক কর্ত্তব্যসকল পালনের সুবিধার জন্য।

রামমোহনের আশা ছিল, পরমেশ্বরের আন্তরিক পূজার উদ্দেশ্যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা এক মন্দিরে একত্র হলে সেই সমবেত ঈশ্বরারাধনার ফলে মানুষে মানুষে শ্রেষ্ঠ ঐক্যবন্ধন রচিত হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হতে রামমোহনের এই আশাকে সফল করে তোলবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতে যেন ব্যাপক ধর্ম্মবিদ্বেষের একটি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। এ সময়ে রামমোহনের ঐ বাণীকে আমাদের কত আশার সঙ্গে, কত সাহসের সঙ্গে ভারতে প্রচার করা উচিত ছিল; ভারতকে বলা উচিত ছিল, "আমাদের

কাছে শান্তির, ঐক্যের, স্থায়ী মৈত্রের পথটি আছে।" কিন্তু আমরা এখনও তা করচি না।

ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য,—রামমোহন রায়ের ঐ বাণী অনুসরণ করা; আপনার মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও মৈত্রীর ভাব প্রবল ও উজ্জ্বল করে তোলা; এবং চারিদিকের সমুদয় ধর্ম্মাশ্রিত লোকদিগকে, নিজ নিজ সাধনে ও কার্য্যে ঐ উদার ভাবকে প্রধান করে তুলতে প্ররোচনা দান করা ও সাহায্য করা।

ভাবী যুগে আমাদের কর্ত্তব্য, ভারতীয় সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রাণ সাধকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করা, এবং সেই ঘনিষ্ঠ যোগের সাহায্যে ভারতে মৈত্রীর মন্ত্র প্রচার করা। এ বিষয়ে এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের নিরুদ্যম হয়ে থাকার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ ভারতবাসীরা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে শান্তি ও মিলন স্থাপন সম্বন্ধে আশা হারিয়ে ফেলছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখে দেখে সাধারণ ভারতবাসী আজ আশাহত হয়ে বলছেন, "ধর্ম্ম নিয়ে মিল হতেই পারে না।" কে এই আশাহত ভারতে নব আশার প্রদীপ জেলে তুলবে? হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের দিকে অভিমুখ হয়ে কার এ কথা বলবার অধিকার আছে, "আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমরা তোমাদের প্রত্যেকেরই আপনার?" এ অধিকার ব্রাহ্মসমাজেরই আছে। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে একান্ত উদাসীন রয়েছি; এমন কি, স্বয়ং আমরাই অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ অন্তরে পোষণ করছি। যেজন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়, তার একটি প্রধান অংশকে আমরা অবজ্ঞা করে ফেলে রেখেছি। আগামী যুগে আমাদের এ কলঙ্ক ধৌত করতে হবে।

অগ্রগতি ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি

আগামী যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আবার অগ্রগতিশীল ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সম্পন্ন ধর্ম্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। "আবার করতে হবে" এ কথা এ জন্য বলছি যে রামমোহন রায়ের সময় থেকে আরম্ভ করে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এ লক্ষণ ব্রাহ্মসমাজে উজ্জ্বল ছিল; এখন যেন তা লুপ্ত হতে চলেছে।

অগ্রগতিশীলতা ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিমত্তা,—এই দুটি গুণ রামমোহন রায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতের সেই অন্ধকার যুগেই তিনি য়ুরোপের কত খবর রাখতেন! ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের অভ্যুদয়, স্পেন ও ইটালীতে স্বাধীনতার সংগ্রাম, আয়র্লণ্ডের অসন্তোষ এবং ইংলণ্ডের রিফর্ম্ বিল,—এ সমুদয় বিষয়ে তিনি সে যুগেই তন্ন তন্ন করে কত জ্ঞান আহরণ করেছিলেন! শুধু জ্ঞান আহরণ নয়, ইহার অনেকগুলির সঙ্গে তিনি চিঠিপত্রের দ্বারা ব্যক্তিগত যোগ রক্ষাও করতেন।

তিনি কেন এত জ্ঞান আহরণ করতেন? কেন চিঠিপত্র লিখে এ সকল ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতেন? তিনি তো মনে করতে পারতেন, আমি একটি নগণ্য দেশের একজন নগণ্য ব্যক্তি, বিদেশের ঐ সকল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার যোগ রেখে কি হবে?

কিন্তু এ যোগ রক্ষা আত্মপ্রকাশের কিংবা অহমিকার ভাব হতে প্রসূত নয়। যা শ্রেয় এবং যা মহৎ, তার একটি আধিপত্যের ভাব (compelling power of the good and the noble) আছে। সুস্থ মানবের উপরে তা প্রবলভাবে কাজ করে। এ 'আধিপত্য' রামমোহনকে ঐরূপে দেশ বিদেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে বাধ্য করেছিল।

কোন মানুষ প্রকৃত মানুষ কি না, তা তার মনের উপরে এই 'আধিপত্যের' দ্বারাই চিনতে হয়। কলিকাতার রাজপথে দু দণ্ড ঘুরে বেড়াও; দেখবে, কোন মানুষকে সিনেমার খবর চঞ্চল করে তুলছে; কোন মানুষ সভা সমিতির খবর পেয়ে সেই দিকে ছুটচে। আবার মানুষের-মত' মানুষেরা, যা ন্যায় ও যা মহৎ তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাচ্ছে। কা'কে কিসে টেনে নেয়, কার উপর কোন বস্তুর compelling power কাজ করে, তা দেখেই মানুষ চিনতে পারা যায়। রামমোহনের এই জীবন্ত মনুষ্যত্বই তাঁকে দেশ বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে বাধ্য করেছিল।

আমরা একবার ভাবি,—এ যুগে আমরা কি রামমোহনের মত জীবন্ত প্রাণবান মানুষ আছি? জগতে যেখানে যা কিছু মহৎ, তার আকর্ষণ কি আমাদের প্রাণকে রামমোহনের মত ব্যাকুল করে তোলে? রামমোহন প্রবল দেশাত্মবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন; ভারতের অণুমাত্র অমর্য্যাদা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই তিনিই আবার উন্নতিশীল বিদেশ সকলের সঙ্গে ভারতকে সমরেখায় (in line) টেনে আনবার জন্য দেশের অপ্রিয় হতে কখনও ভয় করেন নাই। এ যুগে আমরা ভাবি, আমরা কি দেশের কল্যাণের জন্য দেশবাসীর অপ্রিয় হতে তেমনি সাহসী রয়েছি? আমাদের ভিতরে কি রামমোহনের ন্যায়, এক দিকে দেশপ্রীতি, অপর দিকে সৎসাহস, উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন হয়েছে?

বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মসমাজে কিয়ৎপরিমাণে এই অগ্রগতিশীলতার ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিরক্ষার প্রবৃত্তির অভাব দর্শন করে বলা হয়েছিল, ব্রাহ্মসমাজ যেন ক্রমশঃ কূপমণ্ডূক হ'য়ে যাচ্ছেন। 'কূপমণ্ডূক' কথাটি বেশী কঠোর হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সাবধানতারও প্রয়োজন আছে। রামমোহনের দিকে চেয়ে বলি, অহমিকার জন্য নয়, আত্ম-প্রকাশের জন্য

নয়, আপনাদের নাম ঘোষণা করবার জন্যও নয়, কিন্তু প্রাণবত্তা ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবার জন্য সাবধানতার প্রয়োজন আছে। ভারতের সমুদয় বৃহৎ বৃহৎ কর্মোদ্যোগের সঙ্গে এবং বৃহৎ বৃহৎ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রের সঙ্গে কি আমরা যোগ রক্ষা করছি? আমাদের পাঠ-গোষ্ঠীতে (study circlesএ) কি আমরা সে সকলের বিষয়ে আলোচনা করছি? মিশনারী নহেন, এমন ১০।১২ জন য়ুরোপীয় ও আমেরিকান ভারতবন্ধু এসে ভারতের নানা গ্রামে বসেছেন, এবং গ্রামের লোকদের জীবনের পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন; আমরা কি তাঁদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারছি? "বৃহত্তর ভারত সঙ্ঘ" এবং চৈনিক ও মুশ্লিম সংস্কৃতির সঙ্গে কি আমরা ভাল করে যোগ রক্ষা করছি? ভারতের অন্য যে কোন দল অথবা সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ এ সকলের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে অধিক পরিমাণে দায়ী। ব্রাহ্মসমাজের জন্ম-সময়েই ব্রাহ্মসমাজকে যদি সর্ব্ব ভারতের ও সর্ব্ব জগতের জন্য দাঁড়াতে হয়, যদি হিন্দুসমাজপ্রসূত মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের একটি উপাসনামণ্ডলী মাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে না হয়, তা হলে এ সকলের সঙ্গে যোগ না রাখা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ঘোরতর অপরাধ।

ইসলাম যখন খুব সজীব ছিলেন, তখন তৎকালীন সমুদয় সভ্য জগতের জ্ঞান ও আদর্শ সকল আহরণ ও চতুর্দ্দিকে পরিবেশন করেছিলেন। ভারতের গণিত চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বহু শাস্ত্র, পারস্যের কবিতা ও শিল্প, গ্রীসের দর্শন,—এ সমুদয়কে মুসলমানগণ স্পেন পর্য্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে পরিবেশন করেছিলেন। সে যুগের ইসলামের এই প্রাণবত্তা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি চিহ্ন রেখে গিয়েছে। তা এই যে, রামমোহন রায়কে জ্যামিতি ও আরিষ্টটলের দর্শন আরবী ভাষাতে পড়তে হয়েছিল।

একদিন রামমোহন সমগ্র দেশকে ডেকে বলেছিলেন, "পিছনে পড়ে থেকো না; এগিয়ে এস, উন্নতিশীল জগতের সঙ্গে সমরেখায় এস।" আর, আজ কি নিদ্রামগ্ন ব্রাহ্মসমাজকেই জাগিয়ে বলবার দরকার হবে যে "পিছনে প'ড়ে থেকো না; উন্নতিশীল ভারতের সঙ্গে ও উন্নতিশীল জগতের সঙ্গে সমরেখায় এস?"

নৈতিক ঐকান্তিকতার ধর্ম্ম

ভাবী যুগের উপযোগী হতে হলে ব্রাহ্মসমাজকে বলতে হবে যে ধর্ম্ম প্রধানতঃ পূজা-অর্চনা, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণার ব্যাপার নয়; ধর্ম্মের প্রধান মূল নৈতিক ঐকান্তিকতা (moral earnestness)। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তা' প্রথম যুগে ছিল মতপ্রধান ও জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম; খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক জন্ম, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, doctrine of Logos, প্রভৃতি মত ও তত্ত্ব নিয়েই সে যুগের খৃষ্টানেরা বেশী ভাবতেন। দ্বিতীয় যুগে খৃষ্টধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের হাতে প'ড়ে হ'য়ে উঠল তপঃপ্রধান ধর্ম্ম; জপ-তপ, মালা ফেরানো, ধ্যান ধারণা এবং সংসার-বিরাগ,—এ সকলই দ্বিতীয় যুগের খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশেষ ভাব। প্রশ্ন এই যে, প্রথম যুগের ভাব অথবা দ্বিতীয় যুগের ভাব, কোনটি কি খ্রীষ্টধর্ম্মকে বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তুলতে পারত? এ দুটির কোনটি কি খ্রীষ্টধর্ম্মকে এত দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারত, এবং ভাবী যুগে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? পারবে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে মানবমনে আধিপত্য করচে, এবং ভাবি যুগে বেঁচে থাকবে, তার অন্য একটি স্বরূপের বলে,—যাকে অনেক পরবর্ত্তী কালে সে-ধর্ম্মে সঞ্চার করেছিল উত্তর য়ুরোপের লোকেরা,—যাহাদিগকে সভ্যতাভিমানী রোমকগণ বর্ব্বর বলে মনে করতেন।

সে-স্বরূপটি কি? সে স্বরূপটি—সূক্ষ্ম বিবেক-পরায়ণতা; **delicate, sensitive conscientiousness.**

এখন ক্রমশঃ খ্রীষ্ট সমাজ পৌরোহিত্যের ও রাজনীতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে ধর্ম্মরাজ্যে অধিক অধিক পরাক্রান্ত হয়ে উঠচেন। বর্ত্তমান খ্রীষ্ট ধর্ম্মে জীবনের ও চরিত্রের উপরে যে ঝোঁক আছে, উহাই তাহার এই প্রভাব বৃদ্ধির মূল কথা। ভাবী যুগে পৃথিবীর কোনও ধর্ম্ম যদি চরিত্রকে তার প্রধান ব্যাকুলতার বিষয় করে না তোলে, তবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নৈতিক ঐকান্তিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ঘটলে শক্তির পরীক্ষায় তার পক্ষে পরাস্ত হয়ে যাওয়া অনিবার্য্য।

এখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বাণী, একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা কর, মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ কর। এ বাণী ঘোষণা করলেন রামমোহন। দ্বিতীয় বাণী, পরিবার ও সমাজ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। এ বাণী ঘোষণা করলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। তৃতীয় বাণী, সমগ্র জীবনকে বিবেকানুগত কর; বিবেকের আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ। কেশবচন্দ্রের এই তৃতীয় বাণী ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জ্জন্ম দান করেছে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই জীবন-বাণী, যার বলে ইহা চিরজীবী হতে পারবে, যার জন্ম চির দিন পৃথিবীর মানুষের এ ধর্ম্মে প্রয়োজন থাকবে।

এ বিষয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রয়েছে। কেবল পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম হতে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই কুসংস্কারমূলক কোনও মতকে ছেঁটে ফেলবার কাজটি আমাদের করতে হয় নাই। কিন্তু আমাদের অতি সাবধানে চিন্তা করা প্রয়োজন যে আগামী যুগে আমাদের ধর্ম্মের প্রধান ঝোঁকটি থাকবে কিসের উপর।

১৮৫৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলন হয়। তখন হতে ব্রাহ্মধর্মের এই তৃতীয় লক্ষণটি প্রকাশ পেতে আরম্ভ হয়। ১৮৬০ সালে সঙ্গত-সভার জন্ম হয়। সঙ্গত-সভাই নৈতিক ঐকান্তিকতা ও বিবেক-পরায়ণতাকে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বোজ্জ্বল লক্ষণে পরিণত করে তুলেছিলেন। আমরা ভেবে দেখি, আমরা কি করছি। আমরা কি আমাদের ধর্মের এই লক্ষণটির উপরেই প্রধান ঝোঁক (emphasis) রেখেছি? না, অন্য কোনও দিকে, অন্য কিছুর উপরে প্রধান জোর দিতে আরম্ভ করেছি?

চরিত্রই ধর্মের প্রধান অঙ্গ, এই কথা বলে সে যুগে ব্রাহ্মসমাজ সমগ্র দেশকে একটি নূতন প্রেরণা দান করেছিলেন। ঈশ্বর তোমার কাছে নির্ভুল মত ও নিখুঁত ধ্যান-ধারণা যত চান, তার চেয়ে হাজার গুণে বেশী চান নির্ম্মল উদার ও মহৎ চরিত্র—এই বাণী সে যুগে ব্রাহ্মসমাজ হতে ধ্বনিত ও ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

কেন সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল? তার কারণটি মানব-প্রকৃতির গূঢ় স্থানে নিহিত। বিশুদ্ধ মত, নিখুঁত ধ্যান-ধারণা,—এ সকল বস্তু শিক্ষা-সাপেক্ষ। এর জন্য জ্ঞান-চর্চ্চা চাই, গুরুর উপদেশ চাই, দীর্ঘ অধ্যয়নাদির দ্বারা মনকে মার্জ্জিত করা চাই। কিন্তু কি মার্জ্জিত কি অমার্জ্জিত, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত,—সকল মানুষের মস্তকই শুদ্ধ সরল ও উন্নত চরিত্র দেখে তৎক্ষণাৎ নত হয়, এবং তার সমগ্র চিত্ত তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধার দ্বারা উন্নত হয়ে ওঠে। তাই ব্রাহ্মসমাজের এ বাণী সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখন কি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজই এ বাণীকে খর্ব্ব করবেন?

ভাবী যুগ ও শ্রদ্ধার অপচার

উন্নত জীবনের ও উন্নত চরিত্রের প্রতি মানবমনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, মানবসমাজে তাহাই প্রবলতম শক্তি। মানবসমাজ এ শক্তির ক্রিয়াতে যেরূপ উৎক্ষিপ্ত ও উত্তোলিত হয়, এমন অপর কোনও শক্তির ক্রিয়াতে হয় না। আপনারা দেখে থাকবেন, কুলিরা একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডের (lever) নীচে কোনও এক বিন্দুতে একখানি বড় পাথর (fulcrum স্বরূপ) রেখে সেই দণ্ডের দীর্ঘ প্রান্তে চাপ দিয়ে অপর প্রান্তস্থ ভারী মাল সহজেই উত্তোলন করে। বিজ্ঞানে ইহাকে lever (অর্থাৎ উত্তোলন-যন্ত্র) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ বলেছিলেন, Give me a fulcrum and I will lift the world. পৃথিবী উত্তোলনকারী এমন যন্ত্র (lever) কি সত্যই আছে? আছে। তা, মানব অন্তরে ঈশ্বর-রোপিত এই শ্রদ্ধা-বৃত্তি। মানবসমাজে এমন প্রচণ্ড শক্তি আর কিছু নাই।

বর্ত্তমান যুগে মানবের এই নৈতিক ঐকান্তিকতার সম্মুখে একটি বড় সমস্যা উপস্থিত। তা এই পবিত্র শ্রদ্ধাশক্তির অপব্যবহার, অপচয়, অপচার। মহত্তের প্রতি সম্মানই মানবসমাজের প্রবলতম শক্তি। এত দিন বুদ্ধ যীশু মহম্মদ চৈতন্য প্রমুখ ধর্ম্মনেতা, সাধুভক্ত, এবং লোকহিতৈষী ত্যাগী পুরুষ ও চরিত্রবান মনুষ্যগণই মানবসমাজের পূজা পেয়ে আসছিলেন। নিউটন সেক্সপীয়র প্রভৃতি যে সকল মানুষ মানবমনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেছেন অথবা শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরাও এত দিন মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করে আসছিলেন। কোনও জাতির বা মানবমণ্ডলীর শ্রদ্ধা লাভ করবার জন্য, তাঁদের স্মরণীয় মানুষের দলভুক্ত হবার জন্য, চরিত্র জীবন অথবা

অনুষ্ঠিত কল্যাণকর্ম্ম এর চেয়ে কম দরের হলে চলত না,—ইহাই ছিল এত দিন সাধারণের সম্মান লাভের শাশ্বত নিয়ম।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সে ব্যতিক্রমের বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনা করবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলা যথেষ্ট যে, চলচ্চিত্রের যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবন হতে চরিত্রের পঙ্কলেপ সারাজীবনে কখনও ধৌত হল না, তাদের ছবি ভদ্র পুরুষ ও নারী অবিচারে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসচেন; ক্রমে এখন শিশু-সাহিত্যকে পর্য্যন্ত তাদের ছবি ও জীবন-চরিত আক্রমণ করছে। এ দেশেও দেখতে পাই, চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না রেখে, যাঁরা শুধু সাহিত্যিক কবি অভিনেতা বা জননায়ক, এমন মানুষদিগকে চিন্তাবিহীন জনসাধারণ অবিচারে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা দান করতে আরম্ভ করেছে। জনসমাজের যে-পূজা পূর্ব্বে কেবল ধর্ম্মের চরিত্রের জ্ঞানের ও লোকহিতের প্রাপ্য ছিল, তা যখন এইরূপে লিপি-কৌশলের কলা-কৌশলের কিংবা ব্যবসায়ে সফলতার পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন সুস্থ মানবমন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে থাকতেই পারে না। জনসমাজের সম্মানধারাকে এইরূপে নিম্নতর খাতে, কখনও কখনও বা অপবিত্র খাতে, প্রবাহিত করে দেওয়া চরিত্র ও আচরণের দ্বারা যিনি হয়তো সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করেছেন এমন মানুষকে পূজার আসনে বসানো,—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়-দের দৃষ্টির সম্মুখে ইহাদিগকেই আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণীরূপে তুলে ধরা,—ইহার সমান সর্ব্বনাশকর কার্য্য অতি অল্পই আছে। শ্রদ্ধা যেমন মানবসমাজে প্রবলতম শক্তি, শ্রদ্ধার অপচার তেমনি মানবসমাজে প্রবলতম অকল্যাণ। শ্রদ্ধার সুপ্রয়োগে জনসমাজ ত্বরায় উন্নত হয়; শ্রদ্ধার অপপ্রয়োগে জনসমাজ তেমনি ত্বরায় অবনত হয়। সত্যের অপলাপ অপেক্ষাও শ্রদ্ধার অপপ্রয়োগ অনেক অধিক সাংঘাতিক

অকল্যাণ; এই অকল্যাণ নিবারণের জন্ত ভাবী যুগে তরুণগণ যেন ব্যগ্রতার সহিত, উদ্যোগের সহিত, সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হন।

সেবায় আত্মোৎসর্গ

চরিত্রই ধর্মের প্রধান অঙ্গ, চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ বল,—ইহা ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় জীবন-বাণী। ব্রাহ্মসমাজই এ দেশে এ বাণী প্রথম ঘোষণা করেন; পরে সমগ্র দেশ ইহা গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ কখনও কোন সত্যের 'প্রথম ঘোষণাকারী' বলে গর্ব্ব করতে চান না; কিন্তু নম্র ভাবে ও ব্যাকুল ভাবে সত্যের অনুসরণ করাই স্বীয় কর্ত্তব্য বলে অনুভব করেন।

যা হোক্, এ তৃতীয় জীবন-বাণীর পরে কি আর ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য ও ব্রাহ্মদের জন্ত ঈশ্বর কোনও নূতন জীবন-বাণী প্রেরণ করেন নাই? ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে বাণী স্বয়ং সাধন করবেন, আবার দেশেও যা প্রচার করবেন, এমন আর কোনও বাণী কি ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন নাই? করেছেন বই কি! ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে মহৎ কর্ম্মে আত্মোৎসর্গের ও আত্মবলি-দানের যে বাণীটি এত সম্মানিত, তা তো ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী! এ বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ দেশের পথপ্রদর্শক। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাণী রাষ্ট্রনীতির বাণী থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক। তা শুধু কর্ম্মে নহে, কিন্তু যুগপৎ সাধনে ও সেবায়, যুগপৎ আত্মসংযমে ও কর্ম্মোদ্যোগে মানুষকে প্রেরণা দান করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কর্ম্মীর ধর্ম্ম বটে কিন্তু ঈশ্বরানুগত ও জলন্ত চরিত্র-সম্পন্ন কর্ম্মীর ধর্ম্ম।

১৮৯২ সালে, (বঙ্গ-ভঙ্গ, স্বদেশী-আন্দোলন, ও সে সকল হতে উত্থিত রাজনৈতিক উন্মাদনার বহু বৎসর পূর্ব্বে), আচার্য্য শিবনাথের

মুখ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ সেবার আদর্শ বিষয়ে নূতন এক বাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন, "সাহসের সঙ্গে সেবা কার্য্যের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ কর, এবং সেবকগণ সেবার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হও! সেবকের নিকটে সেবাই সর্ব্বোচ্চ, তার তুলনায় ধন তুচ্ছ, মান তুচ্ছ, সুখ তুচ্ছ, প্রাণ তুচ্ছ।" শিবনাথের সে-যুগের অগ্নিময় সঙ্গীত,—"সে বাণী পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে, সঁপিবারে জীবন যৌবন, অনলে পতঙ্গ যেমন,—বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য আহুতি ঢালি, সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন,"—এখনও আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

শিবনাথ এ সময়ে ভাব-বাষ্পে চালিত যুবক ছিলেন না; তিনি এ সময়ে ৪৫ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় সেবক। কিন্তু তাঁর আজীবনের আদর্শ এই ছিল যে, অন্তরের গোপনে নিজ চরিত্র গঠন এবং বাইরে জগতে সেবা-কার্য্য, উভয়ই সমভাবে করতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে সেবককে সমভাবে অনুপ্রাণনে অগ্নিময় হয়ে থাকতে হবে। এজন্য শিবনাথকে ভাবলেই আমার white heatএর কথা মনে পড়ে। শীতল লৌহখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ; অল্প উত্তপ্ত হলেও তা কৃষ্ণবর্ণই থাকে। ক্রমে অধিক উত্তপ্ত হলে প্রথমে রক্তবর্ণ, পরে শ্বেতবর্ণও হয়। শিবনাথের জীবন-বাণী এই,—"যদি চাও যে চরিত্রকে শুদ্ধ রাখবে, ও যদি চাও যে তোমার সেবা-কার্য্য ঈশ্বরের ও দেশমাতার গ্রহণযোগ্য হবে, তা হলে শুদ্ধতার সাধনা ও ঐকান্তিক সেবা উভয়ের দ্বারা জীবনকে এই শ্বেতবর্ণ উত্তাপের, white heatএর অবস্থায় উত্তপ্ত করে রাখ।"

শিবনাথের সেই জীবন-বাণী, সেই সেবা-বাণী, সেই কর্ম্মোদ্যোগ-বাণী, সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য-আত্মোৎসর্গের বাণী সে যুগের অনেকগুলি তরুণ ব্রাহ্মকে অগ্নিময় করে তুলেছিল,—সাধনে ও সেবায় উৎসর্গীকৃত করে তুলেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ কর্ম্ম এবং

অনেকগুলি বিশাল কর্ম্মোদ্যোগ ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান ১৮৯২ সালের সেই বাণীর ও সেই কর্ম্ম-প্রেরণার ফল। কিন্তু তরুণ ব্রাহ্মগণ, তোমরা মনে রেখ আগামী যুগে তোমাদের কাজ,—শুদ্ধ ও সংযত চরিত্রের দ্বারা আত্মাতে যে সবল মাংস-পেশী প্রস্তুত হয়, তা তোমরা অর্জ্জন করবে, এবং তার সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজকে নানা বিশাল কর্ম্মোদ্যোগে তোমরা প্রবৃত্ত করবে। এ উভয়ের দিকে তোমরা সমভাবে মনোযোগী হও।

ব্রাহ্মসমাজের ভাবী ধর্ম্মধারা সম্বন্ধে কি আশা করি ?

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন মূলক ধর্ম্ম হয়ে সমাজসংস্কার, সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবামূলক ধর্ম্ম হয়ে বীরত্ব মনুষ্যত্ব ও আত্মোৎসর্গ সঞ্চারকারী ধর্ম্ম হয়ে ভারতে দণ্ডায়মান থাকবেন।

আমরা আশা করি, ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরোপাসনা ভাবী যুগে চিন্তা ও মনন অপেক্ষা বরং মানব-জীবনের প্রশ্ন, মানব-জীবনের সংগ্রাম, মানব-জীবনের আনন্দ, মানব-জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মানব-জীবনের আদর্শ,—এ সকলকেই অধিক প্রতিবিম্বিত করবে। তখন হয়তো আর খেদ করতে হবে না যে ব্রহ্মোপাসনা মানুষকে আকৃষ্ট করে না।

আমরা আশা করি, আগামী যুগে ব্রাহ্মসমাজের ভক্তি কেবল প্রাচীন অশ্রু-কম্প-পুলক-স্বেদ-মূর্চ্ছা প্রভৃতি ভাবচর্চ্চায় পর্য্যবসিত হবে না। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, মানবজীবনের সকল সুখ-দুঃখ, মানবজীবনের সকল প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা ভক্তিকে পুষ্ট করবে। বিশেষতঃ মানবের সমুদয় জ্ঞান,—মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, সকলই—আগামী যুগের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার প্রেমভক্তি-জনিত সম্বন্ধকে নব মাধুর্য্য ও নব পুষ্টি দান করবে।

ঈশ্বরানুভূতির ও ঈশ্বরভক্তির উপাদান কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়? প্রাচীন উত্তর ছিল, অন্তর-ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে। আমরা আশা করি, ভাবী যুগে ব্রাহ্মসমাজ তার সঙ্গে যোগ করবেন, জীবনক্ষেত্রে ও জগৎক্ষেত্রে; এবং ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ জীবনক্ষেত্রকে এমন করে গঠিত করবেন যাতে জগৎ ও জীবন উভয়ই ব্রাহ্মদের অন্তরক্ষেত্রকে ঈশ্বরানুভূতির ও ঈশ্বরভক্তির অধিক অনুকূল করে তুলতে পারে।

ভাদ্র, ১৩৪৬

ব্রাহ্মসমাজ ও মিলনমন্ত্র

ব্রাহ্মসমাজ একমেবাদ্বিতীয়মের চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আপনি ঐক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে ভারতকে ঐক্য-বন্ধনে বাঁধবে। ব্রাহ্মসমাজ সে-প্রতিজ্ঞা বারবার বিস্মৃত হচ্ছে; তাকে বার বার উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

ধর্ম্ম যতই বাইরে থেকে অন্তরের দিকে, প্রথা থেকে জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তা অধিক সত্য হয়, এবং ততই তা মানুষে মানুষে মিলনের ভাবকে অধিক বর্দ্ধিত করে। অতীতকালে অতিরিক্ত বাইরের আড়ম্বর কতকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বলে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে দিত। বর্ত্তমান যুগে পূজার পদ্ধতিসকলে ও সমাজসংগঠনের ব্যবস্থা-সকলে (organisation) বাইরের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের মাত্রা এত অল্প হয়ে যাচ্ছে, এবং সে-সকল এত অধিক পরিমাণে চিন্তা ও যুক্তি-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, চিন্তায় প্রতিষ্ঠার জন্তই সে-সকলকে আপাততঃ ধর্ম্মের অন্তরের দিক বলে ভ্রম হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে পূজা অর্চ্চনা এবং মানুষ সম্বন্ধে দলগঠন ও মানুষকে স্বদলে আনয়ন,—এ সকলও ধর্ম্মের প্রথার দিক, প্রণালীর দিক, ও বাইরের কাজের দিক মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভক্তি ও আনুগত্য, এবং মানবের প্রতি প্রীতি, মানবের নিঃস্বার্থ সেবা, মানুষকে প্রেমের মাধুর্য্যের ও চরিত্রের সৌন্দর্য্যের দ্বারা আপনার করে নেওয়া,—এ সকলই ধর্ম্মের অন্তরের দিক ও জীবনের দিক।

অন্তরের ও জীবনের ধর্ম্ম পৃথিবীতে মিলন বিস্তার করে। ইহার

কারণ এই যে, সকল ধর্ম্মেরই অন্তরতম ব্যাপারটি একরূপ। একটি তুলনার সাহায্যে এই সত্যটি বুঝবার চেষ্টা করি।

একটি বাঙ্গালী যুবক পশ্চিমের একটি সহরে গিয়ে এক জন সদাশয় লোকের বাড়ীতে অতিথি হ'লেন। প্রথম প্রথম তিনি অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে বাস করতে লাগলেন, ও সেখানে থেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন যে, বাড়ীর লোকগুলির স্নান আহার বিশ্রামের সময় কিরূপ, ও রীতি কিরূপ; এবং আপনার সকল কার্য্যে তিনি সেই রীতির অনুসরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপরে ক্রমশঃ পরিচয় একটু বৃদ্ধি পেলে তিনি গৃহস্বামীর বসবার ঘরে এসে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, ও এইরূপে সে-বাড়ীর মানুষগুলির মতামত এবং রুচি-অরুচি বুঝে নিলেন; কার প্রকৃতির ঝোঁকটি কোন দিকে, তা ভাল করে জেনে নিলেন। ঘনিষ্ঠতা আরও বর্দ্ধিত হলে, ক্রমশঃ তিনি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের এবং কর্ত্তা ও গৃহিণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে অন্তঃপুরে গমনাগমন করবার অধিকার লাভ করলেন, ও সেখানকার আলাপে, আমোদ-আহ্লাদে ও কার্য্যে তাঁদের সঙ্গী হয়ে পড়লেন। গৃহিণী যেখানে বসে রান্না করেন, কর্ত্তা ও গৃহিণী যেখানে পুত্র কন্যাদের নিয়ে কথা বলেন, সেখানে গিয়ে তিনি বসতে লাগলেন। "বড় ছেলেটি বিদেশে গিয়েছে, শিক্ষা শেষ করে ফিরে এলে বাড়ীর অবস্থা ভাল হবে," এই কথা বলতে বলতে পিতামাতার চোখে মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের একটি দীপ্তি জ্বলে উঠল। "সে ছেলেটি বড় ভাল, তার মনটা বড় মমতায় ভরা। সে যখন বিদেশে যাবে, তার কয়েক দিন আগে আমাদের ছোট মেয়েটি মারা যায়। সে বোনটি ঐ ছেলের বড় প্রিয় ছিল। বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে সে সেই বোনকে স্মরণ করে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে নীরবে কত কান্না কাঁদল,"—এসব বর্ণনা করতে

করতে পিতামাতার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অন্তঃপুরের এই সকল দৃশ্য দেখে দেখে সেই বাঙ্গালী যুবকটি ভাবতে লাগলেন, "এ বাড়ীখানি তো ঠিক আমার সুদূরে স্বদেশের বাড়ীখানিরই মত। এই পিতামাতার স্নেহও ঠিক আমার পিতামাতার স্নেহেরই মত। ইচ্ছা হয়, ইঁহাদের পুত্রস্থানীয় হয়ে ইঁহাদের স্নেহের অংশ লাভ করে ধন্য হই।"

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম যেন এক একটি গৃহ। সেই গৃহের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যেন তিনটি অবস্থা আছে। প্রথম পরিচয়ে তার পূজার রীতি, উপাসনার সংস্কৃত কি আরবী কি ল্যাটিন মন্ত্র, এবং উপনয়ন, জলাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠান চোখে পড়ে। দ্বিতীয় অবস্থায়, সে-ধর্ম্মের মতামত কিরূপ, তার বিশেষ বাণীটি কি এবং তার বিশেষ ঝোঁকটি কোন্ দিকে, মানুষ তা লক্ষ্য করে। তৃতীয় অবস্থায়, সে তার অন্তঃপুরের সংবাদ পায়।

ভিতর বাড়ীর খবর যেমন সব পরিবারেই এক প্রকার, ধর্ম্মের অন্তঃপুরের খবরও তেমনি সব ধর্ম্মে এক প্রকার। তা কি খবর? মায়ের প্রাণটা তাঁর সন্তানের জন্য কেমন ব্যাকুল হয়, এই খবর। যে ছেলেটি কাছে রয়েছে, তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কিরূপ এবং যে সন্তান দূরে গিয়েছে, তার জন্য মায়ের ব্যাকুলতার প্রকাশটি কিরূপ, এ খবর। যে ধরা দিয়েছে, তাকে পেয়ে মায়ের মনটা কেমন সুখী, আর যে ধরা দিচ্ছে না, তাকে নিজের কোলে টেনে আনবার জন্য মায়ের কিরূপ অস্থিরতা, এ খবর। মায়ের ভালবাসার, মায়ের ব্যাকুলতারই নানা বর্ণনা; তারই নানা ইতিহাস, তারই নানা উচ্ছ্বাস, তারই নানা তরঙ্গ, তারই নানা লীলা, তারই নানা কীর্ত্তি। এর সঙ্গে সঙ্গে, মায়ের জন্য সন্তানের ভক্তি ভালবাসার, মায়ের চরণে সন্তানের

আনুগত্যের ও আত্মসমর্পণের কত বিচিত্র আকার, কত বিচিত্র প্রকাশ, কত বিচিত্র ভাষা!

সকল ধর্ম্মের অন্তঃপুরে এই একই কাহিনী। সে কথা এমনই মধুর যে প্রাণকে তা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করে। মাতৃভক্তিতে যার হৃদয় কোমল ও সিক্ত, এমন মানুষ যদি কোথাও গিয়ে দেখতে পায় যে, একটী মা স্নেহে গদ্‌গদ হয়ে নিজ সন্তানকে আদর করছেন, তবে তৎক্ষণাৎ তারও সেখানে সেই মায়ের সন্তান হয়ে তাঁর স্নেহের অংশী হতে ইচ্ছা করে। যেখানে মাতৃস্নেহের লীলা সেখানেই তার প্রাণ লোলুপ হয়। ধর্ম্ম-জগতেও তেমনি। পৃথিবীর যে দেশেই হোক, যে যুগেই হোক, যে সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়েই হোক, যেখানে জগজ্জননীর স্নেহ দয়া বিশেষ ভাবে তাঁর মানব-সন্তানের দিকে নির্ঝরের মত ঝরেছে, সেখানেই তা দেখে ভক্তের চক্ষু সজল, ভক্তের চিত্ত লোলুপ হয়ে উঠেছে। সেখানেই ভক্ত দুবাহু তুলে 'মা! মা!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নির্ঝরধারায় স্নান করে নিয়েছেন। সেখানেই তিনি সেই সন্তানদলে মিশে গিয়ে তাদের ভক্তির সঙ্গে নিজ ভক্তিকে মিশিয়েছেন।

এই জন্য দেখতে পাই, সকল ধর্ম্মেরই মরমী সাধকগণ আচারবাদী-দিগের অপেক্ষা একটু পৃথক ধরণের মানুষ হন; তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী থাকেন না। তাঁরা সকল ধর্ম্মেরই মর্ম্মস্থানে প্রবেশ ক'রে তার সরস সুধাধারার আস্বাদন ক'রে নেন। তাঁদের কাছে কোন ধর্ম্ম আর 'পর' থাকে না।

তবে কি সম্প্রদায় ও মণ্ডলীর কোনও মূল্য নেই? আছে বই কি? পরিবারের যে মূল্য, সেই মূল্য আছে। যাদের সঙ্গে রক্তের যোগ, শিক্ষার ও ভাবের যোগ, এক পূজার প্রণালীর যোগ, একই ধর্ম্ম-ইতিহাসের যোগ রয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের

অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ হবেই। কিন্তু সন্তানকে ভালবাসতে গিয়ে যেমন পৃথিবীর সব মায়েরা বোঝেন যে, আমাদের আহারে পরিচ্ছদে ভাষায় যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, মাতৃত্বে আমরা সকলেই এক, তেমনি সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ লোকেরা জানেন যে, আমাদের আচারে রীতিতে ও পূজার প্রণালীতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও ঈশ্বরের প্রতি মানবের ভক্তি আমাদের সকলের মধ্যে একই বস্তু।

ঈশ্বরকে সত্য পুরুষরূপে অনুভব করে তাঁর আশ্রয়ে, তাঁর আনুগত্যে, তাঁর প্রেমানন্দে জীবন ধারণ, ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ। পূজায় নয়, নিয়ম পালনে নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনের ঈশ্বরমুখীনতাতেই প্রকৃত ধর্ম্মের পরিচয়। ধর্ম্ম, মানুষের কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের সমষ্টি নয়; ধর্ম্ম, জীবনের একটি বিশেষ স্বভাব।

জীবনের দিকটিকে প্রধান স্থানে রাখলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মও পরস্পরের সঙ্গে মিলনোন্মুখ হয়ে উঠে; রীতি ও নিয়মের দিকটিকে প্রধান করলে এক ধর্ম্মের মানুষেরাও ক্রমশঃ পৃথক পৃথক দলে চিহ্নিত ও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজেও তাই ঘটেছে।

জীবন অপেক্ষা নিয়মপালনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন কালে এ দেশে কত ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা আমরা জানি। সত্য বটে, অতীতকালের সেই ভেদবুদ্ধি, বহুদেববাদ, সাকার পূজার নানা প্রণালীর পার্থক্য এবং বাহ্য আচার বিষয়ে নানা শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও ভিন্ন ভিন্ন বিধি-নিষেধ,—এ সকল অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করবার একটি বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু মানুষ বহুদেববাদ, সাকার পূজা ও বাহ্য আচার ত্যাগ করলেই যে ভেদবুদ্ধির ঊর্দ্ধে উঠে যায়, তা নয়। নিরাকার এক দেবতার পূজারই

বিভিন্ন পদ্ধতি, অথবা ধর্ম্মসাধনের এক একটি বিশেষ ভাবের ও আদর্শের প্রতি এক এক সাধকদলের বিশেষ ঝোঁক, অথবা সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রণালী,—এ সকলও ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে, যদি এ সকলের গুরুত্ব বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবশেষে স্বদল ও পরদলের ভেদচিহ্ন হবার গৌরব এদের প্রদান করা হয়, যদি ধর্ম্মের প্রধান দৃষ্টি জীবনগত ধর্ম্ম হতে উঠে গিয়ে এ সকলের প্রতি আবদ্ধ হয়। বাহ্য আচারের রীতি বিষয়েই হোক, কি আধ্যাত্মিক পূজা ও সাধনের রীতি বিষয়েই হোক; ধর্ম্ম একবার কোনও দিক দিয়ে রীতিপ্রধান হয়ে উঠলেই তা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করতে থাকে।

কেহ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' ব'লে, কেহ 'Our Father which art in Heaven' ব'লে, কেহ 'লা ইল্লাহা ইল্লিল্লাহ্' ব'লে, কেহ বা নিজের মনের ভাব নিজের মনোমত শব্দে ব্যক্ত করে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন। কেহ ব'সে, কেহ জানু পেতে উপাসনা করেন। কেহ কোন বিশেষ মহাপুরুষের প্রভাবে অনুপ্রাণিত, কাহারও বা কোন বিশেষ সাধুভক্তের সঙ্গে যোগ নেই। এ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসকগণের সকলেরই জন্য জীবনের দুঃখতাপে ঈশ্বরের আশ্রয়ের মূল্য একরূপ, জীবনে ঈশ্বরের দয়ার অনুভব একরূপ, জীবনে ঈশ্বরের অধীনতার ভাব ও ঈশ্বরের নির্ভরের ভাব আয়ত্ত করবার জন্য সংগ্রাম একই রূপ। এ সকল নিয়েই ধর্ম্ম। কে এমন আছে যার সঙ্গে একত্র বসে সেই পরমপিতার আশ্রয়ের অনুভব, সেই পরম দয়ালের দয়ার অনুভব আস্বাদন করতে পারি না? জীবনে ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বরে নির্ভর লাভ করবার জন্য প্রার্থনা করতে পারি না? যে রাজা রামমোহন রায় আন্তরিক ধর্ম্মের ও তজ্জনিত একতার মহান্ আদর্শটি ভারতে প্রচার করেছিলেন, আজ তাঁর স্বর্গবাসী আত্মা হতে এই মহৎ বাণী ব্রাহ্মসমাজের দিকে নেমে

আসছে,—"ব্রাহ্মসমাজ বাহ্য আচারের ভিন্নতাজনিত ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করে এসেছেন; এখন ব্রাহ্মসমাজকে উপাসনা-পদ্ধতির, সাধনাদর্শের, অনুষ্ঠান-প্রণালীর ও সমাজব্যবস্থার ভিন্নতাজনিত ভেদবুদ্ধিও অতিক্রম করে আসতে হবে। বরং এ সকলের বিচিত্রতাতেই ব্রাহ্মসমাজকে আনন্দিত হতে হবে।"

আজ বিশ্বাস-নয়নে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কি দেখতে পাই? ব্রাহ্মসমাজ তাঁর দ্বিতীয় শতাব্দীর জীবনে কি-ভাবে প্রবেশ করবেন? কঠোর রীতি-সর্ব্বস্বতায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, আবার সাধন ও তপস্যার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-সকল মুছে ফেলে উদাসীন শিথিলতার মিলনে মিলিত হয়েও নয়; কিন্তু রীতির সকল বিচিত্রতা সত্ত্বেও এক হয়ে, পার্থক্য সত্ত্বেও এক হয়ে, পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবেসে জীবনগত ধর্ম্মের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে হাতে হাতে ধরে অগ্রসর হবেন।

তরুণগণ, আমার এই আশা তোমাদেরও প্রাণের আশা তা আমি জানি। অতীত ঘটনা সমুত্থিত যে উষ্মা একপুরুষ আগের ব্রাহ্মদিগের চিত্তকে তপ্ত করেছিল, তা তোমাদের চিত্তকে তপ্ত করে নি, তা আমি জানি। মিলনের জন্য হাতখানি বাড়াতে আমাদের মধ্যে কাহারও মনে ক্ষণিকের দ্বিধা এলেও আসতে পারে; কিন্তু তোমরা মিলতে ও মেলাতে একান্ত উৎসুক হয়ে রয়েছ তা আমি জানি। আমি সমগ্র প্রাণের সঙ্গে বলতে পারি, তোমাদের সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। আমি সমগ্র প্রাণের সঙ্গে বলতে পারি, ব্রাহ্মসমাজ যতই মলিন অথবা দুর্ব্বল হোক না কেন, ইহা এমন অধম নিশ্চয়ই হয় নি যে ইহাতে বংশানুক্রমে আগত বিবাদই চিরজীবী হবে এবং বংশানুক্রমে আগত ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ধারাসকল বিশীর্ণ হয়ে যাবে। আমি জানি, ব্রাহ্মসমাজের

সকল দলেই এমন মানুষ অনেক রয়েছেন, যাঁদের হৃদয়ে পর-পর ভাবটি একেবারেই বিদ্যমান নাই। আমি জানি, পরস্পরকে ভাই বলে বুকে ধরবার আগ্রহ অনেক হৃদয়ে বহু দিন ধরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে। তুচ্ছ বাধা বিঘ্ন কবে সরে যাবে, সকল দল কবে এক হবে, বহু দিনের সঞ্চিত মিলন-পিপাসা এক প্রবল স্রোতে সকল অভিমান অভিযোগ কবে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার জন্য অনেক হৃদয় অপেক্ষা করছে; অপেক্ষা করে করে বেদনাতুর হয়ে উঠছে। আমার হৃদয়ও তার মধ্যে একটি। তরুণগণ, তোমাদের চেষ্টায় কি সে বাধা-প্রস্তর সরবে, হৃদয়ের উৎসগুলি ছুটবার ও মিলবার পথ পাবে?

মিলনের প্রয়াস সম্বন্ধে তিনটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। প্রথম, যে মিলনের আদর্শ আমাদের মনে রয়েছে, তা কেবল নিশ্চেষ্ট উদারতার দ্বারা আয়ত্ত হবার নয়। ইংরেজীতে toleration ও charity বলতে যা বুঝায়, তাদ্বারা এ মিলনসংঘটন সম্ভব হবে না। শুধু একে অন্যকে সয়ে যাবে, অথবা একে অন্যের গুণ স্বীকার করব, ইহা যথেষ্ট নয়; এ মিলনসাধনের জন্য অন্যের মহৎ ভাবে, মহৎ আদর্শে, মহান্ প্রয়াসে যত দিন আমরা সঙ্গী হতে না পারছি, তত দিন আপন জীবনকে সে পরিমাণে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল বলে অনুভব করা আবশ্যক এবং স্বয়ং অগ্রসর হয়ে সে সাহচর্য্য অন্বেষণ করা আবশ্যক। "আমি মিলতে প্রস্তুত হয়ে আছি, তুমি এসে আমার সঙ্গে মিলন স্থাপন কর", এই ভাব যথেষ্ট নয়; "আমিই আপনার আত্মার কল্যাণের জন্য যেচে খুঁজে অগ্রসর হয়ে মিলিত হব," এই আগ্রহে মন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখতে হবে, মানুষের সঙ্গ করবার ও মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার ভূমি, শুধু পরস্পরের মতের ও বিশ্বাসের ঐক্যে নয়। সকলের মধ্যে যা সাধারণ, সেই L. C. M. টুকুর ভিত্তিতে যে সম্বন্ধ

দাঁড়ায় তা অকিঞ্চিৎকর। পরিবারে ভাই বোন পতি পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণ পরস্পরকে কি-চক্ষে দর্শন করেন? রুচি ও প্রকৃতিতে পরস্পরের মধ্যে যত মিল ও যত অমিল, সব-শুদ্ধ সমগ্র মানুষটিকে তাঁরা আপনার বলে অনুভব করেন। একজন মানুষ সম্বন্ধে যে কথা, মানুষের দলের সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন ধর্ম্মমণ্ডলীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে তার সঙ্গে মতের ও বিশ্বাসের কতটুকু মিল আছে, শুধু তার গণনা করলে চলে না। সে মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাস, তার অতীত হতে আগত সকল আদর্শ, সকল বাণী, তার সাধুভক্তগণের জীবনের সকল দুঃখ সকল সংগ্রাম ও সকল আশা, তার তীর্থের, শাস্ত্রের ভাষার ও সমবেত ভাবে উচ্চারিত মন্ত্র প্রভৃতির সকল অনুপ্রাণন,—এই সমুদয়ের মধ্যে আপনাকে গভীরভাবে নিমজ্জিত করতে হয়। বৈষ্ণবকে কেবল বুঝতে হলেই যদি স্বয়ং বৈষ্ণব হওয়া আবশ্যক হয়, তবে কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীর সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে হলে তার মর্ম্মস্থলে কতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করা আবশ্যক, একবার তা বিবেচনা করে দেখ।

এক সময়ে এইরূপ একটি কথা শোনা যেত যে, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নব ধর্ম্মের (অথবা 'যুগধর্ম্মের') একটি কাজ এই যে, সে আর-সকল ধর্ম্মকে বিচার করবে, ও তাদের সত্যাসত্য বাছাই করে তাদের সত্যসকলকে সংগ্রহ করবে ও আত্মস্থ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ এ কাজ ধর্ম্মের নয়, এ কাজ পাণ্ডিত্যের। পণ্ডিতেরা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে, কোনও ধর্ম্মান্দোলনকে সম্যকরূপে বুঝতে হ'লে নানাদিক দিয়ে তার মর্ম্মে প্রবেশ করতে হয়; সে কাজের জন্য বহুযুগের চিন্তা ও অধ্যয়ন আবশ্যক হয়; এবং এরূপ ভাবে সম্যক্‌রূপে চিন্তা ও অধ্যয়ন করলেও তাকে একেবারে নিঃশেষে বুঝে নেওয়া কখনও সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সত্যাসত্যের বাছাই

করবার প্রয়াসটিই অজ্ঞজন-সুলভ অগভীর চিন্তা ও দৃষ্টির ফল বলে বর্ত্তমান যুগে একেবারে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজ নিশ্চয়ই তা নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এই যে ইহা মানুষকে সকল ধর্ম্মের মর্ম্মস্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবিষ্ট হতে শিক্ষা দেবে। দোষ গুণ, ভুল ভ্রান্তি, দেশের ও কালের বিশেষ সংস্কার ও বিশ্বাস, এই সকলের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যে-মানুষগুলি এক একটি বিশেষ ধর্ম্মধারা জগতে প্রবর্ত্তিত করেছেন, তাঁদের সকলের জীবনে বিধাতার লীলা অনুভব করতে, তাঁদের সকলকে আত্মার আত্মীয় করে নিতে শিক্ষা দেবে।

মিলনপ্রয়াসীর মনে রাখবার তৃতীয় কথাটি এই যে, মিলনভূমি খুঁজতে হবে দৃষ্টিকে নামিয়ে নয়, দৃষ্টিকে উন্নত করে। বিভিন্ন ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গে মানব-মনকে লঘু ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিতৃপ্তি দেবার যে সকল আয়োজন আছে, তা মিলনের ভূমি হতে পারে না। হিন্দুর হোমানলের ও যজ্ঞমন্ত্রের গাম্ভীর্য্যে, হিন্দুর প্রতিমাপূজার শোভায় সৌন্দর্য্যে সাধারণ মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার বহু উপাদান থাকলেও তা মিলনভূমি হতে পারে না। হিন্দুজাতি যেখানে অজস্র পুরাণ, কাহিনী, যাত্রাগান প্রভৃতি সৃষ্টি ক'রে ধর্ম্মের সঙ্গে চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিকে, ধর্ম্মের সঙ্গে অভিনয়কে মিশিয়ে ফেলেছে, তার ভিতরে আস্বাদন করবার অনেক বস্তু আছে; কিন্তু তা মিলনভূমি হতে পারে না। ধর্ম্মকে এইরূপে নিম্ন ভূমিতে নামিয়ে এনে এ দেশ ধর্ম্মের যে একটি মনুষ্যত্বের দিক ও বীরত্বের দিক আছে, তাকে নিস্তেজ করে ফেলেছে; ধর্ম্মের প্রকৃত অনুপ্রাণনাটি হারিয়ে ফেলেছে। সে ভূমিতে নেমে হিন্দুর সঙ্গে মিলনের চেষ্টা তেমনি নিষ্ফল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খিলাফতের ভূমিতে নেমে মুসলমানের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা

হিন্দুর পক্ষে যেমন নিষ্ফল হয়েছে। তেমনি আবার ধর্মের মাঝে আমোদ অভিনয় সৃষ্টি করে অথবা নীতির রশিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করে সাধারণ জনসমাজকে তুষ্ট করে তাদের সঙ্গে মিলন স্থাপনের চেষ্টাও বৃথা। মিলনভূমি মানব-অন্তরের নিম্নভাগে নয়, ঊর্দ্ধভাগে। একপক্ষ নেমে এসে যে মিলন হয়, তা নয় ; উভয় পক্ষ ঊর্দ্ধে উঠে যে মিলন হয় তা-ই সার্থক মিলন। জগতে চিরন্তন নিয়ম এই যে, কারও সঙ্গে মিলন করবার জন্য যদি তুমি ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চতম ভূমি হতে একটুকুও নিম্নভূমিতে নেমে আস, তবে সর্ব্বাগ্রে তুমি তারই শ্রদ্ধা হারাবে। প্রকৃত মিলনভূমি ধর্ম্মের সহজলভ্য তৃপ্তিসকলে নয় ; প্রত্যেক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শে ও উন্নত প্রয়াসে। হিন্দুর সর্ব্বত্র ঈশ্বরানুভূতির ও চরিত্রে সংযমের আদর্শ, সমাজে ধনী অপেক্ষা ধার্ম্মিককে অধিক মানদানের আদর্শ, বৌদ্ধের অনুষ্ঠান অপেক্ষা শীলের প্রতি অধিক সমাদর, মুসলমানের বিমল একেশ্বরবাদ, ধর্ম্মক্ষেত্রে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, এবং রক্তের ও বর্ণের বৈষম্যবোধের প্রতি একান্ত অনাস্থা, খ্রীষ্টানের নীতিপ্রধান ও চরিত্রপ্রধান ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, উচ্চ ও নীচ সকল মানবাত্মার মূল্যবোধ ও তৎপ্রসূত কল্যাণকর্ম্মে প্রবল আগ্রহ এবং খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের আদর্শ,—এ সকলই মিলনের প্রকৃত ভূমি। প্রত্যেক ধর্ম্মকে প্রত্যেক ধর্ম্ম হতে এই সকল শ্রেষ্ঠ ভাব ও আদর্শ সাদরে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ না করলে সে ধর্ম্মের পক্ষে পশ্চাতে পড়ে থাকা ও জগতের শ্রদ্ধা হারানো অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজকেও এর তিন শাখার প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ আদর্শসকলকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বদেশীয় রীতিসকলের প্রতি গভীর আস্থা, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের বিবেকপরায়ণতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বসাধারণের মতের প্রতি সম্মান, নববিধানের

ভক্তিপ্রধান ভাব,—এ সকল এর প্রত্যেক অঙ্গকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

এই উদার ও উন্নত মিলনভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে আমরা যে শুধু ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার ঐক্যের জন্য প্রয়াসী হব, তা নয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শিখ—সকলের সাধনাকেই আপনার করে নেব এবং ক্রমশঃ সকলকে এক মহাবন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য যত্ন করব।

আচার, অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি ও সমাজরীতি প্রভৃতি যে ধর্মের অঙ্গ নয়, সে সকলের প্রশ্ন যে ধর্মের প্রশ্ন নয়, বর্ত্তমান যুগে একে একে সকল ধর্মই তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। বর্ত্তমান যুগ, ধর্মে অন্তর্মুখীনতার যুগ। এ যুগে ধর্মসকলকে পূর্ব্ব-বর্ণিত উদার ও উন্নত ভূমিতে এসে দণ্ডায়মান হতে কে আহ্বান করবে? পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুভাবে আবদ্ধ হতে কে আহ্বান করবে? বন্ধুভাবে পরস্পরের প্রেমভক্তিরসে ও পরস্পরের অনুপ্রাণনে মগ্ন হয়ে হয়ে, ক্রমশঃ গলে মিশে একাকার হয়ে যেতে কে আহ্বান করবে? এ আহ্বান করবার অধিকারটি বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্মেরই আছে। যিনি দেশের দেশ, যিনি কালের কাল, শতাব্দী যাঁর কাছে তুচ্ছ নিমেষ মাত্র, সেই অকাল-পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে এই মহামিলনের কল্পনা করবার ও তজ্জন্য প্রয়াসী হবার উপযুক্ত মানসশক্তি, উপযুক্ত বিশালদৃষ্টি ও সাহস একমাত্র ব্রাহ্মসমাজেরই আছে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ রাজা রামমোহন রায়ের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি শতাব্দীর দূরতা উল্লঙ্ঘন করে ভারত সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্যের মহান্ আদর্শটি দেখে নিয়েছিল। তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম একদিন মিলিত ভারতের জাতীয় এক ধর্ম হবে; ইহা

ভারতের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন অঙ্গসকলকে যুগে যুগে ক্রমশঃ অধিক অধিক একতাবদ্ধ করে তুলবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল কর্ম্মের পশ্চাতে যাতে এই উচ্চ আশা, এই বৃহৎ সাহস ও এই বৃহৎ অধ্যবসায় চিরবর্ত্তমান থাকে, ব্রাহ্মসমাজ যাতে শুধু মার্জ্জিত মত ও সামাজিক সুরীতি নিয়ে আপনাতে আপনি তৃপ্ত ও দেশ সম্বন্ধে উদাসীন একটি দলে পরিণত হতে না পায়, হে তরুণগণ, আগামী যুগে তোমাদের সে বিষয়ে জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে।

যখন ব্রাহ্মসমাজের এই মহান্ আদর্শের সঙ্গে এর বর্ত্তমান নানা ভাগে বিভক্ত দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার তুলনা করি, তখন হৃদয় ক্ষোভে ও মনস্তাপে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। মনে হয়, রামমোহন রায়ের নামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কলঙ্ক লেপন ব্রাহ্মসমাজই করছে। নব ভারতের যে কোনও অপর সম্প্রদায়ের দিকে চেয়ে দেখ, তাদের কর্ম্মকল্পনা কত বৃহৎ ও সাহসপূর্ণ, তাদের কর্ম্মপদ্ধতি কত সুশৃঙ্খল, তাদের কর্ম্মে সফলতা কত বিশাল। এক এক সময় মনে হয় ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতির হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মভার প্রধানভাবে পতিত হওয়াতেই বুঝি এর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কখনও বা আধ্যাত্মিকতার, কখনও বা আর্টের দোহাই দিয়ে আমরা ভাবের চরিতার্থতাকে এত অধিক অন্বেষণ করছি যে কর্ম্মে আমরা পঙ্গু ও একান্ত অপটু হয়ে পড়ছি; বৃহৎ কল্যাণকর্ম্মের চাপ ও দায়িত্ব অধ্যবসায়ের সঙ্গে বহন করতে করতে মানুষ যে কর্ম্মতৎপরতা ও যে পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা লাভ করে, সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা তর্ক বিতর্ক ও তুচ্ছ দলাদলিতে শক্তি ক্ষয় করতেই অভ্যস্ত হচ্ছি। ভগবানের বিধি এই যে, অনেকগুলি মানুষ যখন কাঁধে কাঁধ দিয়ে একটি বড় কাজে খাটে, তখন তারা সহজেই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য সকল ভুলে

যায়। হে তরুণগণ, যদি তোমরা আগামী যুগে ব্রাহ্মসমাজকে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মকল্পনায় ও কর্ম্মোদ্যোগে টেনে নামাতে পার ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাতে নিযুক্ত রাখতে পার, দেখবে, এর মিলনসম্বন্ধীয় প্রশ্নসকলের সমাধান আপনা আপনি হতে থাকবে; দেখবে, এর অত্যধিক মতবিলাসী ও দ্বন্দ্বপ্রিয় লোকগুলি আপনিই পশ্চাতের আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

মানবসমাজে যোদ্ধার কাজ ও কর্ম্মীর কাজ ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু মানবসমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সংসারে ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভাঙা ও গড়া এ দুই-ই আছে। ব্রাহ্মসমাজে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশকে কুসংস্কার অন্যায় ও অপবিত্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাই ইহার দ্বারা এতদিন সৃষ্টির কাজ ভাল করে সম্পন্ন হয়ে ওঠে নাই। কুসংস্কার বর্জ্জন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, তাই জ্ঞানরাজ্যের সকল উন্নতির ও বিস্তারের সঙ্গে সমতালে চলা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের সঙ্গে যোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্যক্‌রূপে হয়ে ওঠে নি। সমাজের বৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়েছে; তাই সকল শ্রেণীর মানুষের, বিশেষতঃ সমাজের অধস্তন শ্রেণীর এবং নারীর যুবকের ও বালকের শক্তির সদ্ব্যবহারের নব নব ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যথেষ্ট পরিমাণে হয় নি, এবং সমাজের ধর্ম্মজীবনধারাকে এই সকল শ্রেণীর মানুষের উপযোগী করে নানা বিচিত্র আকার প্রদান করবার চেষ্টাও সমুচিতরূপে করা হয় নি। অসাধুতা ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে, তাই সাধুভাবে অর্থোপার্জ্জনের নব নব উপায় উদ্ভাবন, স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে বিশুদ্ধভাবে আমোদ সম্ভোগের আয়োজন সৃষ্টি, সমাজের ও দেশের নরনারীর জন্য মন খুলে পরস্পরের সঙ্গে মিশবার স্থায়ী ব্যবস্থা,—এ সকলের কিছুই করা হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ এতকাল বিপথ সম্বন্ধে যত

নিষেধ ও সতর্কতা প্রচার করেছেন, মানুষের চলবার জন্য নব নব সুপথ সৃষ্টি তত পরিমাণে করতে পারেন নি।

তেমনি আবার, ব্রাহ্মসমাজ এতদিন আত্মরক্ষার কাজে নিরন্তর নিযুক্ত ছিলেন বলে তার দ্বারা দেশের সঙ্গে সর্ব্ববিধ কল্যাণকর্ম্মে মিলিত হওয়াও ভাল করে হয়ে ওঠে নি। পৃথিবীর চিরন্তন রীতি অনুসারে যোদ্ধার কাজ এবং অজানাপথে প্রথম যাত্রীর (pioneer-এর) কাজ করতে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজ এক যুগে দেশের বিপক্ষতা ও তৎপরবর্ত্তী যুগে দেশের কিঞ্চিৎ প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু দেশ এখন ব্রাহ্মসমাজকে এই প্রশ্ন করছেন,—ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখনও কি দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করবার সময় আসে নি? আমরা সকলেই অনুভব করছি যে, সে সময় এসেছে। হে তরুণগণ, সম্মুখে যে যুগ আসছে, তাতে তোমরা দেখবে যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ প্রশ্ন দেশেরও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং দেশের অধিকাংশ কাজ ব্রাহ্মসমাজেরও কাজ হয়ে গিয়েছে। তাই তোমরা বিগত বংশ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দেশবাসিগণের সঙ্গে সহকর্ম্মীর ভাব নিয়ে ও স্রষ্টার ভাব নিয়ে সম্মুখের যুগে প্রবেশ করতে পারবে। তোমাদের হয়তো আর দেশের বিপক্ষতার অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে না। ইতিহাসে চিরদিন দেখা গিয়েছে, বীর-হৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বীরাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে বন্ধুভাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ করতে পেরেছেন। জগতে বীর-হৃদয় বন্ধুগণই শ্রেষ্ঠ বন্ধু, বীর-হৃদয় কর্ম্মিগণই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। পৃথিবীর সকল কল্যাণ-কর্ম্মেরই রীতি এই যে, তার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মিগণকে অন্তরে-অন্তরে যোদ্ধৃপ্রকৃতি নিয়ে কর্ম্ম করতে হয়; কারণ, জগতে এমন কোনও যুগ আসে না, যখন অসত্য অন্যায় অসাধুতা অপবিত্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে

হয় না, অথবা উন্নততর ভূমিতে যাবার জন্য কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন থাকে না। দেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ম্ম করতে গিয়ে তোমরা বীরজনোচিত উদারতার সঙ্গে মিলবে, বীরজনোচিত সহিষ্ণুতার সঙ্গে খাটবে। কিন্তু তোমরা সে-কর্ম্মেই খাট, কখনও ভুল না যে তোমরা যোদ্ধাদের সন্তান। যিনি তোমাদের যোদ্ধৃপ্রকৃতি পিতৃগণের রাজা, যিনি তোমাদের জীবনের রাজা, সেই রাজরাজেশ্বরের, সেই পবিত্রস্বরূপের, সেই সত্যস্বরূপের প্রতি অণুমাত্র অবিশ্বস্ততার আচরণ তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

মিলনাগ্রহকে সজীব ও সচেষ্ট করে নিয়ে তাকে উদার ও উন্নত ভূমিতে স্থাপন করে ধর্ম্মের অন্তরের দিকটিকে অধিক প্রধান স্থানে রেখে, পরমত সম্বন্ধে বীরোচিত সহিষ্ণুতা এবং অসত্য অন্যায় ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে বীরোচিত সতর্কতা চিরজাগ্রত রেখে যাতে ব্রাহ্মসমাজ নূতন যুগে বৃহত্তর কল্যাণকর্ম্মে আপন জীবনকে সফল করে তুলতে পারেন, ভগবান সেই ভাবে তোমাদিগকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করুন।

১০ই মাঘ, ১৩৩৪

বংশের সম্পদ রক্ষা

ব্রহ্ম যে মানুষকে ধরেন, তারই যুগযুগান্ত-প্রসারিত ইতিহাসের এক অধ্যায় হল ব্রাহ্মসমাজ। হে অমৃতের পুত্রকন্যাগণ,—ভাল করে ভেবে দেখ, ব্রহ্ম কি তোমায় কোন দিন ধরেছেন? অন্যায় কাজ করবার সময় তোমার হৃদয়কে কি কোন দিন কম্পিত করে দিয়েছেন? তোমার হাতখানিকে কি কোন দিন থামিয়ে দিয়েছেন? তাঁর সঙ্গে কি জীবনে এমন যোগ স্থাপন করেছ, তাঁকে কি তোমার নিজের উপর এমন অধিকার দান করেছ যে, তিনি তোমাকে থামাতে পারেন, শাসন করতে পারেন; আবার জাগাতে পারেন, ওঠাতে পারেন? যে-ত্যাগ কঠিন, যে-আত্মসংযম, আত্মসংবরণ কঠিন, যে-আত্মোৎসর্গে ধন প্রাণ মান সব তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই ত্যাগে, সেই আত্মসংযমে, সেই আত্মোৎসর্গে নিয়োজিত করতে পারেন? ব্রহ্মকে জীবনে এমন সত্য করে তোলা, এমন সত্য হতে দেওয়া—ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কাজ।

তরুণদের প্রতি

তরুণেরা অনেকে বলেন, "ঈশ্বরকে তো ভাল করে বুঝতেই পারি না; তবে আর ধর্ম্মজীবনের জন্য আগ্রহ আমাদের মনে কেমন করে জাগবে?" তাঁদের আমি বলি, ঈশ্বরকে ভাল করে বুঝতে পারাটা আগে হয় না। যা কিছু সত্য ন্যায় ও পবিত্র, তাতে তাঁর অনুমোদন ও তাঁর আদেশ, এবং যা কিছু অসত্য অন্যায় ও অপবিত্র,

তাতে তাঁর অপ্রসন্নতা ও তাঁর নিষেধ অনুভব করাটাই মানব-জীবনে আগে আসে। পাঁচ বৎসরের শিশু তার বাবা মার প্রকৃতি স্বরূপ অভিপ্রায়, এ সব প্রায় কিছুই বোঝে না; কিন্তু সেও বোঝে যে তার বাবা মা তাকে কেমন দেখতে ইচ্ছা করেন; সেও বোঝে যে তার মা বাবা তাকে ভালবাসেন। বিধি-নিষেধ বোঝা ও প্রেম অনুভব করা,—এ দুটি ব্যাপার, স্বরূপ বুঝবার অনেক আগে থেকেই উৎপন্ন হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এ কথা অনন্ত গুণে অধিক সত্য। তাঁর দুরবগাহ অনন্ত স্বরূপ কে নিঃশেষে বুঝতে পারে? মানব-মনের সব সংশয় হতে কে উত্তীর্ণ হতে পারে? জ্ঞানের সংশয় কখনও নিঃশেষে দূর হয় না। সেই অনন্ত জ্ঞানময়েরই এই বিধি যে একটু জ্ঞান আয়ত্ত করলেই আবার সম্মুখের পথে জ্ঞানের নব প্রশ্ন, নব সংশয় এসে উদয় হয়; কারণ জ্ঞানের কখনও শেষ নাই। এর মধ্যে যে-মানুষ ঈশ্বরতত্ত্ব ভাল করে আয়ত্ত করবার আগে থেকেই নীতিমান চরিত্রবান সত্যপরায়ণ নম্র সংযতচিত্ত ও সংযতবাক হবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করে,—যার অন্তরের এই দিকটি ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত,—চিন্তাগত সংশয়ের জন্য ঈশ্বর কখনও তাকে দূরে ফেলেন না। তিনি তাকেও আদর করে বুকে ধরেন। তিনি তারও জীবনে ধর্ম্মের বল, ধর্ম্মের শান্তি, ধর্ম্মের স্নিগ্ধতা প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেন। যাদের মনের অবস্থা এইরূপ, তাদের বলি, "তোমরা এস; তোমাদের কোন ভয় নাই; ব্রাহ্মসমাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের অন্তরে যদি চরিত্রবান হবার জন্য, মহৎ জীবন যাপন করবার জন্য, সেবায় আপনাদের অর্পণ করবার জন্য ব্যাকুলতা থাকে, তার মধ্য দিয়েই তোমরা ঈশ্বরকে ধরতে পারবে, ঈশ্বরও তোমাদের ধরতে পারবেন।"

কিন্তু যে-মানুষ বলে যে, "ঈশ্বরকে এখনও ভাল করে বুঝতে পারি না, অতএব আমি ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে, নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হয়েই

থাকব, শিথিল হয়েই থাকব, বিবেককে স্থূল করেই রাখব,—সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, পবিত্রতা-অপবিত্রতা বিষয়ে মনে খুব তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগাব না,—কাজে কর্ম্মে ব্যবহারে বিবেকানুগত জীবনের জন্য ব্যাকুলতার সাধন করব না,”—সে-মানুষ কোন দিনই ঈশ্বরকে ধরতে শিখবে না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এই কথা বলে যে, মানুষ ঈশ্বরকে ধরে এবং ঈশ্বর মানুষকে ধরেন, তার প্রবল ও ব্যাকুল বিবেকানুগত্যের মধ্য দিয়ে, তার প্রবল ও ব্যাকুল মহৎ-আকাঙ্ক্ষাসকলের মধ্য দিয়ে।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের অনুপ্রাণনধারা রক্ষা করা

ব্রাহ্মসমাজ কেন আছে? ব্রাহ্মসমাজকে আমরা কি চক্ষে দেখব? ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে কোন tradition, কোন ধারা রক্ষা করব ও ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কাছে দিয়ে যাব? ব্রাহ্মসমাজের অতীত অতি গৌরবময়। অতীতের সেই অনুপ্রাণনধারা কিসে অব্যাহত থাকবে?

এই প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে সকলেরই সর্ব্বাগ্রে মনে হবে যে, প্রাচীন যুগের গৌরবকাহিনী নিত্য স্মরণ করে করেই অনুপ্রাণনধারা অব্যাহত থাকে। এর মতন সত্য কথা, এর মতন গুরুতর ভাবে প্রয়োজনীয় সত্য কথা, ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অতি অল্পই আছে। যে-জাতির যে-সম্প্রদায়ের নব নব বংশ এই অনুভূতির ও এই স্মৃতির হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয় যে, আমাদের পূর্ব্বাপর সকল বংশ বিশেষ একটি আদর্শকে, বিশেষ একটি চরিত্র-লক্ষণকে সযত্নে রক্ষা করে আসচেন,—দুঃখ সয়ে, সংগ্রামে লড়ে, অপমান নির্য্যাতন বহন করেও তাকে রক্ষা করে আসচেন,—যে-জাতির যে-সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই এবং দু জন চার জন মিলে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতা করতে আরম্ভ করলেই পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ বিষয়ে আলাপ করে,—যারা সেই গৌরবের কাহিনী

নিজেদের বাড়ীতে শুনতে পায়, নিজেদের বিত্তালয়ে শুনতে পায়, নিজেদের বন্ধুমণ্ডলে শুনতে পায়,—তাদের মধ্যে সেই অনুপ্রাণনধারা অব্যাহত থাকে। এ রকম বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সেই গৌরবের অনুভূতি অন্তরে বহন করে জগতের সম্মুখে উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হতে শিক্ষা করে।—এই উন্নত শিরে দণ্ডায়মান্ হবার কথা বার বার স্মরণ করতে হবে।

ভগবানের কৃপায় অতি দুর্ব্বল মানবের মধ্যেও এবং অতি দুর্ব্বল জাতির চরিত্রেও ক্রমশঃ এই প্রণালীতে উন্নত শির ও ঋজু মেরুদণ্ডের অভ্যুদয় হয়। মেকলে যে-যুগের বাঙ্গালী-চরিত্রের বর্ণনা করেছিলেন, তা ছিল কেশবচন্দ্রের এক শ' বছর আগেকার যুগ। এই এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালী-চরিত্র কত যে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, এবং তা যে বিধাতার কোন কোন বিধানের মধ্য দিয়ে হয়েছে, সে কথা স্মরণ করা যাক্। চাটুকার, খলতা, মিথ্যা ব্যবহার,—এ সকলই মেকলের মতে তখনকার বাঙ্গালীর স্বভাবগত ছিল। ঐ কথা যে নিতান্ত মিথ্যা তা নয়।

মেকলে-বর্ণিত কালের এক শতাব্দী পরে এল কেশবচন্দ্রের যুগ। এই এক শ' বছরে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "দেশের অন্তর্জীবনে এই এক শতাব্দীর সব চেয়ে বড় ঘটনা কি কি," তবে বলব "Battle of Plassey" নয়; ইংরেজের দেওয়ানী পাওয়া নয়; Sepoy Mutiny নয়। ঐ এক শত বৎসরের সবচেয়ে বড় বড় ঘটনা,—রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ও জীবন, দেবেন্দ্রনাথ ও বিত্তাসাগরের জন্ম ও জীবন, কেশবচন্দ্রের জন্ম ও জীবন।" ঐ এক শ' বছরের মধ্যে বাঙ্গালী রামমোহনের কাছে একমাত্র মহান্ পরমেশ্বরের বার্ত্তা, সর্ব্বমানবের ভ্রাতৃভাবের বার্ত্তা শ্রবণ করল। তাঁর জীবনে ও বিত্তাসাগরের জীবনে

জনহিতের জন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে মনুষ্য-কৃত নিন্দা অপমান সহ্য করবার দৃষ্টান্ত দর্শন করল। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সত্যের জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবার দৃষ্টান্ত দর্শন করল। কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অনুবর্ত্তীদের কাছে বিবেকের বাণীকে এবং বাক্যে কার্য্যে ও চিন্তায় একান্ত শুচিতাকে শিরোধার্য্য করবার দৃষ্টান্ত দেখল। প্রহারে, সামাজিক নির্য্যাতনে, আত্মীয়গণের ও দেশের মানুষের হাতের অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে মানুষ কেমন করে নিজ আদর্শকে রক্ষা করে,—শুধু নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসকেই নয়, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ ধর্ম্মপ্রাণতাকে, আলাপে ব্যবহারে গাম্ভীর্য্যকে, সাহিত্যে ও আমোদে পবিত্রতাকে রক্ষা করে চলে—তার দৃষ্টান্ত দেখতে পেল।

কিন্তু যে-সকল মহাপুরুষের নাম আমি করলাম, কেবল তাঁদের জীবনই এই শতাব্দীর বৃহত্তম ঘটনা নয়। তাঁরা ছাড়া আরও শত শত অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষ,—যারা সর্ব্বস্ব দিয়েছে কিন্তু কখনও অসত্য আচরণ করে নি, যারা হাসিমুখে দারিদ্র্য বরণ করেছে কিন্তু জীবনকে কলঙ্কিত করে নি, ব্রাহ্মধর্ম্ম যাদের জীবনকে দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্বে পূর্ণ করেছেন, যাদের মানবীয় জীবনকে দেব-জ্যোতিতে উজ্জ্বল করেছেন,—তাদের সামান্ত জীবনগুলিও এই এক শতাব্দীর বৃহত্তম ঘটনার অন্তর্গত। এই সকল জীবনের নীরব অথচ অপ্রতিহত প্রভাবের ফলেই এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালীচরিত্রে মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়ে গেল। দেশে নূতন এক শ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব হল। যারা উন্নত চরিত্র ও নির্ম্মল বিবেক নিয়ে মানুষের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, যাদের জীবনের গতি মেকলে-বর্ণিত সরীসৃপ-গতি নয়, এমন এক দল মানুষের উদয় হল। তাদের প্রভাবে দেশটা ক্রমে ক্রমে মানুষের দেশে পরিণত হতে লাগল। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এটি একটি মহৎ পরিবর্ত্তন।

আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে যে, "কেউটের বাচ্চা যাই চলতে শেখে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলতে ও ফণা ধরতে শেখে; কিন্তু কেঁচোকে দেখ,—সে ধাড়ী হলেও মাথা জাগাতে পারে না।" বিজ্ঞান বলেন, সরীসৃপ জাতির দেহের অস্থি-সংস্থান এমন যে, তারা মাটিতে বুক ঠেকিয়েই চলবার যোগ্য। কেবল বহুযুগব্যাপী বিবর্ত্তনের (evolutionএর) ফলে উচ্চ শ্রেণীর কোন কোন সরীসৃপের মেরুদণ্ডে এমন নূতন পেশী (muscle) সঞ্চার হয়ে যায় যে তারা মাথা জাগাতে পারে। কেউটের সে পেশী আছে; তাই সে মাথা উঁচু করে। কেঁচোর তা নাই, তাই সে মাথা তুলতে পারে না। সে নিতান্তই of the earth, earthy.

জীব-জগতে evolutionএর নিয়মে সরীসৃপ জাতির মেরুদণ্ডে মাথা তুলবার muscle যুক্ত হতে কত যুগ লেগেছে, তা জানি না। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপার বিধানে, আমাদের দেশের মানুষের মনের জীবনে এক শ' বছরের মধ্যেই এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। মানব-ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলার মধ্যে যে-সকল ব্যাপারকে দেখে 'অলৌকিক' বলতে ইচ্ছা হয়, এক শ' বছরের মধ্যে বাঙ্গালী-চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন তার মধ্যে অন্যতম।

এই উন্নত শির, উন্নত মেরুদণ্ড নিয়ে দেশের মধ্যে প্রথম কারা দাঁড়িয়েছিলেন? বাঙ্গালী-চরিত্র হতে, ভারতীয় চরিত্র হতে যুগযুগান্তরের কলঙ্ক এ যুগে প্রথম কারা ধৌত করেছিলেন? তোমার কি মনে আছে যে তাঁরাই ব্রাহ্ম; তাঁরাই সর্ব্ব প্রথম জাতীয় মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও উন্নত করে দেন? আজ কি সেই তোমরাই চেয়ে চেয়ে দেখবে যে তোমাদের সন্তানেরা হয়ে যাচ্ছে of the earth, earthy? তাদের চরিত্রে কোন আদর্শ নাই; তারা দেশের লোকের সামনে

নিজেদের ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত? এর জন্য দায়ী কে, তা একবার ভেবে দেখ!

ব্রাহ্মসমাজে যদি আমরা ঐ অনুপ্রাণনধারা,—আমরা 'ব্রাহ্ম' বলে মনে মনে গৌরবের অনুভূতির ধারা,—আমাদের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চার করতে না পেরে থাকি, তবে সে অক্ষমতার মূল আমাদেরই জীবনে ও চরিত্রে রয়েছে। আমাদের অন্তরে সেই গৌরবানুভূতি আমরাই রক্ষা করি নাই। সংসারের ধন মান ও প্রতিপত্তিকে যত সম্মান দিয়েছি, ধর্ম্মপ্রাণতার প্রতি, চরিত্রবত্তার প্রতি, ঈশ্বরের নামে ও ঈশ্বরের কাজে আত্মসমর্পণের প্রতি ততখানি শ্রদ্ধা দান করি নাই,—হয়তো প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাও পোষণ করেছি। এ অবস্থা তারই দণ্ড। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, সকলে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো,—যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েরা ব্রাহ্মসমাজকে ও তার ধর্ম্মাদর্শ ও চরিত্রাদর্শকে শ্রদ্ধা ক'রে দেশের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখে, তার জন্য নিজ নিজ পরিবারে তাঁরা কি করেছেন? কয় দিন কয় জন ব্রাহ্ম সাধুভক্তের কথা ছেলেমেয়েদের কাছে বলেছেন? নিজ নিজ জীবনের দ্বারাই বা তাদের সম্মুখে কি প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন? আমরা নিজেরাই যদি of the earth, earthy হয়ে জীবন যাপন করে থাকি,—তবে কি আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের বাচ্চাগুলি স্বর্গের দিকে মাথা তুলবে? তারাও তা হলে of the earth, earthy হয়েই পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে।

আমাদের বিশেষত্ব

আমরা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে নিই যে, চরিত্রই জনসমাজে প্রবলতম শক্তি। আমাদের চরিত্রসম্পদকে আমরা রক্ষা করব। এক শতাব্দীতে সৃষ্ট ঐ tradition আমাদের মহা সম্পদ; তাতেই আমাদের

বিশেষত্ব। ব্রাহ্মসমাজ এক যুগে দেশে বড় বড় আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেছিলেন, ও জাগ্রত রেখেছিলেন তা সত্য বটে। এখন অন্য অন্য আন্দোলন দেশে বড় হয়ে উঠেছে। উঠুক। সেগুলি বাইরের বস্তু। সে সকলের তালিকায় আমাদের নাম প্রথম স্থানে নাই-বা রইল। জনসাধারণের মনে অনেকখানি স্থান অধিকার করা, বড় বড় সভা সমিতি করা, সংবাদপত্রে-বড় বড় নাম ঘোষিত হওয়া,—এ সকলের দ্বারা নয়; কিন্তু জীবন ও চরিত্রের দ্বারাই আমরা আমাদের বিশেষত্ব রক্ষা করতে পারব। আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশী ধনসম্পত্তি নিয়ে দেশে অন্য প্রতিষ্ঠান জাগুক; আমাদের নেতাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশী-প্রসিদ্ধ নেতারা সে সকলকে পরিচালিত করুন, তাঁদের নামে তাঁদের কীর্ত্তিতে দেশ বিদেশ মুখরিত হোক; আমাদের চক্ষু থাকুক প্রধানতঃ এই দিকে যে, আমরা ধর্ম্মপ্রাণতায় সত্যে পবিত্রতায়-উদারতায় প্রতিষ্ঠিত আছি কি না। এটি হোক আমাদের বিশেষত্ব।

নিজেদের এই বিশেষত্বের অনুভূতি ব্রাহ্মসমাজের সামান্যতম তুচ্ছতম মানুষের প্রাণে ও আমাদের ক্ষুদ্রতম শিশুদের প্রাণেও কি করে সঞ্চার করে দিতে পারি, সে জন্য সকলে ব্যাকুল হই। নেল্‌সন-কর্ত্তৃক ট্রাফাল্‌গারের নৌ-যুদ্ধ জয় ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি সেই যুদ্ধে তাঁর নৌ-সেনাদিগকে উৎসাহিত করবার জন্য পতাকার সঙ্কেতে তাদের কাছে এই বাণী প্রেরণ করেছিলেন, "England expects that every man will do his duty." কথাগুলি বিশেষ বীরত্ব-ব্যঞ্জক নয়; কিন্তু তার মধ্যে কর্ত্তব্যে দৃঢ় হবার জন্য আহ্বান ছিল। এই আহ্বানে সৈনিকেরা মেতে উঠল; যুদ্ধ জয় হল। এই আহ্বানে যারা মেতে উঠেছিল, তারা কে? তারা কি দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত মানুষ? তা নয়;—যারা দেশের নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ,

অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত, সকলের হেয়, তারা। কিন্তু তাদের অন্তরও দেশের গৌরবের অনুভূতিতে, কর্ত্তব্যপালনের অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল; তাই তারা প্রাণ দিতে পারল। আমরা যদি দেশের মধ্যে অনাদৃত, নগণ্য, ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম হয়ে থাকি, তাতে ক্ষতি নাই,—যদি আমাদের মধ্যে ঐ বিশেষত্বের অনুভূতি, ঐ কর্ত্তব্যবোধ, ঐ সত্যপরায়ণতা নিত্য জাগরিত থাকে। মানব-সমাজের বহিঃপ্রাঙ্গণে থাকে তার প্রতিষ্ঠানগুলি, তার সর্ব্বসাধারণের চক্ষুগোচর ব্যাপারগুলি; অন্তঃপুরে থাকে মানুষের পবিত্র ও উন্নত জীবন; তার ধর্ম্মভাব, তার প্রেমভক্তির অমৃত।

আমরা কারা? আমরা সেই মানুষ, যাদের প্রাণপণ সঙ্কল্প এই যে, সকলের ধিক্কৃত লাঞ্ছিত অপমানিত হলেও আমাদের চরিত্রাদর্শ, আমাদের সত্যপরায়ণতা সাধুতা পবিত্রতার আদর্শ আমরা রক্ষা করবই। তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকব। জগৎ তর্জ্জন করে বলবে, "তোরা নগণ্য, তোদের সকলের পশ্চাতের আসনে ফেলব; তোদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলব।" বলুক। আমাদের উত্তর যেন এই হয়,— "যখন সত্যপরায়ণতার পরীক্ষার দিন আসবে, যখন আলাপে, আচরণে, মজলিসে, সাহিত্যে, আমোদ-আহ্লাদে উচ্চ পবিত্রতা রক্ষার পরীক্ষার দিন আসবে, তখন দেখে নিও, আমরা কারা!" "ভাবী ভারতের পক্ষে আমরা যেন পরম মহেশ্বরের নিযুক্ত অন্তঃপুররক্ষী ভৃত্যের সমান।"

তত্ত্ব, না সত্য ঘটনা

আমাদের ধর্ম্মটা কেবল কতগুলি চিন্তার অধিগম্য, অতিসাধারণ (abstract) সত্যের সমাবেশ নয়; তত্ত্বজ্ঞান মাত্র নয়। ধর্ম্ম হ'ল একজন সত্যস্বরূপ, জীবন্ত জাগ্রত concrete পুরুষের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ। ঈশ্বর abstract ন'ন, তিনি অতিশয় concrete; তিনি দেখা দেন,

তিনি কথা বলেন, তিনি হাতখানি ধরেন, তিনি মানুষকে টেনে তোলেন। যে-মানুষ, যে-মানবমণ্ডলী তাঁর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে, তিনি তাকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেন। আমরা এই জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের উপাসক। মানবজীবনে ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের এই সকল concrete ব্যাপারই আমাদের ধর্ম্ম-বার্ত্তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আমাদের উপাসনা উপদেশ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের মধ্যে মানুষের জীবনের এই সকল concrete ব্যাপারকেই সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখা উচিত। কিন্তু আমাদের উপাসনাতেও কেবল সাধারণ তত্ত্ব; আমাদের উপদেশেও কেবল সাধারণ তত্ত্ব! এর ফল এই হচ্ছে যে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দিচ্ছি। কি করে এই ভুল সংশোধন করি? কি করে যিনি জাগ্রত জীবন্ত পরমপুরুষ, তাঁকে ধোঁয়ার মত, ছায়ার মত বলে প্রকাশ না করে, আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে তাঁকে সত্য ও জীবন্ত বিধাতা বলে ধরিয়ে দিতে পারি? ইহা আমাদের ব্যাকুল হয়ে ভাবা প্রয়োজন।

প্রত্যেক পরিবারে এই ভাবে ঈশ্বরকে concrete ব'লে, মানব-জীবনে লীলাময় বলে দেখা এবং সন্তানদের দেখানো প্রয়োজন। যাদের এ সৌভাগ্য হয়েছে যে, সে-রকম জলন্ত চরিত্রসম্পন্ন মানুষদের দেখেছেন ও তাঁদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন তাঁরা ধন্য! তাঁরা মনের পথ ও নয়নের পথ উভয়ের দ্বারা ধর্ম্মের পবিত্র প্রভাবটি গ্রহণ করেছেন। যদি তেমন দৃষ্টান্ত তোমাদের চোখের সম্মুখে না-ও থাকে, তবু তাঁদের কাহিনী শিশুদের কাছে বল এবং তাদের পড়তে দাও; সেই সত্যস্বরূপ কেমন করে মানবকে সত্যে দৃঢ়, প্রলোভনে অটল, অপমানে অম্লান হবার জন্য বল দান করেন, তার দৃষ্টান্তসকল আমাদের শিশুরা শ্রবণ করুক, পাঠ করুক, ধ্যান করুক।

মানুষের মন কখনও খালি থাকতে পারে না। হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, তোমাদের ছেলেমেয়েদের মনে শুদ্ধ-চরিত্র পুণ্যকীর্ত্তি ব্রাহ্ম সাধুভক্তদের জীবনকাহিনী মুদ্রিত করে দিতে, তাদের চোখের সম্মুখে রাখবার জন্ম এমন মানুষের ছবি যোগাতে, তোমরা কোন চেষ্টা করছ না। কিন্তু তোমরা কি মনে করছ যে, তাদের মনের সেই কক্ষ শূন্য থেকে যাচ্ছে? মন কখনও শূন্য থাকে না। তোমরা জানছ না, কিন্তু তাদের মনে অনেক অযোগ্য মানুষের কাহিনীতে ও ছবিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে; হয়তো বা সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের লীলা ও ভঙ্গী ও ছবিতেই পূর্ণ হয়ে উঠছে। এখনও কি আমরা উদাসীন থাকব? সেই গৌরবময় উত্তরাধিকার কি আমরা হারাব? তবে আমাদের কি মূল্য থাকবে? ভারতে ও বঙ্গদেশে একটা third-rate organization হয়ে বেঁচে থেকেই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকব? আমরা যে-চরিত্রসম্পদে সম্পদবান, আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের মধ্যে যে সেই সম্পদের মূল্য-অনুভূতি সঞ্চার করতে হবে, তা কি আমরা ভুলে যাব? ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সম্পদ,—ধর্ম্মে দৃঢ়তা, চরিত্রে মহত্ত্ব, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা। এই আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

মাঘ, ১৩৪৩

ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম্ম

১

ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক বস্তু। সর্ব্ব মানবের জন্য ও সকল যুগের জন্য ধর্ম্ম এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু সেই এক ও অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুও মানব-সমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ঈশ্বর কখনও কখনও কোন দেশকে, কোন জনমণ্ডলীকে, তাঁহার পবিত্র আশীর্ব্বাদরূপে এক একটি বিশেষ মহান্ দুঃখ প্রদান করেন, এক একটি বিশেষ মহৎ সংগ্রামে নিক্ষেপ করেন। প্রাণবান্ সমাজের মানুষ নানা ভাবে তার প্রত্যুত্তর দেয়, তাতে respond করে। বর্ত্তমান দুঃখ-সংগ্রামের স্পর্শে ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের আহ্বানে ভারতবাসীর মন ধর্ম্ম বিষয়ে কি ভাবে সাড়া দিলে তা শ্রেষ্ঠ হয়, ভারতবাসীর মনের ধর্ম্মচেতনা কি আকার ধারণ করলে তা ঐ নব সংগ্রামের ও নব অবস্থার উপযোগী হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তা জয়িষ্ণু আকার ধারণ ক'রে ভারতে ব্যাপ্ত হ'তে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করা একান্ত আবশ্যক।

জগতের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রাচীনকালে ধর্ম্ম মানুষের মনকে প্রধানতঃ পূজা-অর্চ্চনার প্রণালী অথবা তত্ত্বরাজ্যের ও ভাবরাজ্যের উচ্চশিখরে বিহার করবার প্রণালী শিক্ষা দিতেন। যেন পরলোকের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়াই ধর্ম্মের একমাত্র অথবা প্রধান কাজ ছিল। এই ভাব ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে আসছে। ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম্ম সংসারকে যে শুধু অবজ্ঞা করবেন না, তাই

নয়, সংসারকে সম্মান করবেন। সংসারই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রেই আমাদের মহত্ত্বের বা ক্ষুদ্রতার পরীক্ষা হয়। এই সংসারকে শ্রদ্ধা করে এখানে খাটতে হবে। ভাবী যুগে যোগ-ধ্যানের, তত্ত্বজ্ঞানের, ভক্তি-প্রেমের, বৈরাগ্য-সাধনের প্রধান পরীক্ষা এই হবে যে, এ সকলের সাধনা মানুষকে ইহলোকে কল্যাণকর্ম্মে সফল করে তুলতে পারছে কি না। অন্তর্লোকের সম্পদ পরীক্ষিত হবে ও ব্যবহৃত হবে বহির্জগতে; ভাব-সম্পদের পরীক্ষা হবে মধুর চরিত্রে ও মানবপ্রীতিতে।

কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতা

এই কারণে ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম্মকে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার উপরে, আনন্দ ও উৎসাহের উপরে জোর দিতে হবে। প্রাচীন কালের সেই দুঃখবাদকে ও সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ততাকে জয়িষ্ণু ধর্ম আর ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করবে না; অসুস্থ মনের লক্ষণ বলেই মনে করবে। এই জগতেই আমরা জীবিত থাকি, বাস করি, উঠি-পড়ি, হাসি-কাঁদি। এই জগতেই মানুষকে ভালবাসি ও মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসবার পথে প্রথম পা ফেলতে শিখি। এই জগৎ, এবং এই জগতে সুখে দুঃখে যাপিত আমাদের জীবন, উভয়েরই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল থাকব। হাসিমুখ ও প্রফুল্লতা আমাদের স্বভাব হবে। এই জগতে জীবিত থাকা, অথচ একে ভাল না বলা, ভাল না বাসা, খুসীমনে জীবিত না থাকা,—এ লক্ষণটি আর কোনদিন ধর্ম্মের লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। বরং ভাবী যুগের ধর্ম্মে মরণোন্মুখ সাধু পুরুষও এই পৃথিবীকে ভালবাসা জানিয়ে এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

মনুষ্যত্ব

ভাবী ভারতে জয়িষ্ণু হতে হলে ধর্মের একটি লক্ষণ হবে মানুষে মনুষ্যত্ব সঞ্চার করা এবং মানুষের মনুষ্যত্বের সকল বাধা দূর করা। "নিজের পথ নিজেই দেখে নেব, নিজের কর্ত্তব্য নিজেই ঈশ্বরের আলোকে নির্ণয় করব"—এ প্রবৃত্তির অণুমাত্র হ্রাস হলেও মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হতে থাকে।

মনুষ্যত্বের প্রধান মন্ত্র—স্বাধীন বিবেক। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যেন নানা কারণে এ মন্ত্রটি ক্ষীণ হয়ে আসছে। একটি কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে দলবদ্ধ কাজের বড় প্রাধান্য হয়েছে। এর ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে দলের বা দলের নেতার নির্দ্দেশ অবিচারে মান্য করতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ভোটের দ্বারা দল গঠনের সময়ে এই প্রণালীর প্রয়োজন থাকতে পারে বটে; প্রয়োজন থাকলেও তা সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হব না। কিন্তু মানবের অন্তর-ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে এই প্রণালী বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ প্রকার কাজ বিবেককে নিষ্প্রভ করে, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে।

দ্বিতীয়তঃ, কোনো মানুষের মধ্যে কোনো দিক দিয়ে অসাধারণত্ব প্রকাশ পেলে সে মানুষকে অতিমানব, অথবা অভ্রান্ত মানব অথবা অবতার করে নেবার একটি প্রবৃত্তি দেশে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি, তাঁর ছবি বা মূর্ত্তি ঈশ্বর-বোধে পূজা করবার প্রবৃত্তিও দেখা দিয়েছে। এই শ্রেণীর সমুদয় আতিশয্যের মূলে থাকে, ব্যক্তিগত বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, এবং তার ফলে মনুষ্যত্বের অভাব। ভারতে নবযুগের জয়িষ্ণু ধর্মের বুলি হবে, "নিজের স্বাধীন বিবেককে সম্মান কর, নিজের মনুষ্যত্বকে সম্মান কর।"

এই মনুষ্যত্ব ও এই স্বাধীন বিবেকপরায়ণতা হ্রাস হয়ে গেলে শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি হয়, তা নয়; দলের সম্প্রদায়ের ও জাতির

জীবনেরও গুরুতর ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ? মানুষের মনের মধ্যে এখনও এত নিগড়, আহারে ব্যবহারে এখনও বাহ্য আচারের এত দাসত্ব, নিজের ধর্ম্মকর্ম্মের ভার অন্যকে দেবার রীতি এখনও এত প্রবল যে, এ জাতিকে বয়স্ক মানুষের জাতি না বলে খোকার জাতি বলতে ইচ্ছা হয়। এই খোকার জাতিটাকে মানুষের জাতি করে গড়ে তুলতে হলে ভাবী ভারতে ধর্ম্মকে একটি প্রবল মনুষ্যত্ব-সঞ্চারকারী শক্তি হয়ে দণ্ডায়মান হতে হবে।

যে-ধর্ম্ম মানুষকে বলবে, "তোমার নেতা, তোমার পরিচারক তোমার অন্তরে আছেন, বাইরে নাই"; যে-ধর্ম্ম অন্তরবাসী সেই দেবতার বাণীকে মানবমনে সর্ব্বপ্রধান করে তুলবে; যে-ধর্ম্ম মানুষকে পরাক্রান্তের কাছে ভয়ে লুণ্ঠিত মস্তক পুনরায় উন্নত করে তুলতে শেখাবে; যে ধর্ম্ম মানুষকে অধিকাংশের ভয় হতে মুক্ত করে দিয়ে প্রয়োজন হলে একা দাঁড়াবার বীর্য্য প্রদান করবে; ভাবী ভারতে পুনরায় এইরূপ মনুষ্যত্ব-সঞ্চারকারী ধর্ম্ম প্রচার করা চাই।

এইরূপ ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালে এ দেশে একবার প্রচারিত হয়েছিল। তখন দেশে 'বিবেক' কথাটি রাজনীতিতেও সম্মানিত ছিল; তখন তার ফলে ৩০ কোটির মধ্যে অন্ততঃ কয়েক সহস্র মানুষের মত মানুষ ভারতে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পর সে দিন চলে গিয়েছে। যে-যুগসন্ধিতে আমরা দণ্ডায়মান, তা'তে পাশ্চাত্য সভ্যজগতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লুপ্ত করবার একটি প্রয়াস চলছে। ভারতেও স্বাধীনতা সংগ্রামে, কল্যাণ-কর্ম্মে, এমন কি ধর্ম্মসমাজে পর্য্যন্ত যেন আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও মনুষ্যোচিত বিবেকপরায়ণতার স্থান লুপ্ত হতে যাচ্ছে। যে-ধর্ম্ম ভারতকে নূতন জয়িষ্ণু জীবন দান করবে, তাকে পুনরায় বিবেকপরায়ণতার ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হতে হবে।

জলের স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, ভাসমান তৃণখণ্ড তা বলে দেয়। ভাসমান একটি কুটোর মত, স্রোত কোন্ দিকে বয়, তা দেখিয়ে দেওয়াই ধর্মের কাজ নয়; কিন্তু দরকার হলে স্রোতে বাঁধ দেওয়া, স্রোতকে ফিরানো ধর্মের কাজ।

বর্ত্তমান জগতে মানবের শ্রদ্ধা-শক্তির অপব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে দিচ্ছে, নৈতিক ঐকান্তিকতাকে ম্লান করে দিচ্ছে। পূর্ব্বে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতির, অথবা পরোপকারপরায়ণ মহামনা পুরুষ ও নারীদের জীবনী চিত্র ও প্রসঙ্গই সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করত, আলাপকে উন্নত করত। এখন তাঁদের স্থান অধিকার করছে অভিনেতা-অভিনেত্রিগণ। যে সম্মান ধর্মজীবনের প্রাপ্য, ঋষিদৃষ্টির প্রাপ্য ছিল, তা যখন অভিনয় শিল্প কিম্বা ব্যবসায়ে সফলতার পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন সুস্থ মানবমনের কর্ত্তব্য হয় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করা। আগামী যুগে সতেজে এই বিদ্রোহ প্রচার না করলে দেশে বীর্য্যবান মনুষ্যত্ব নূতন করে জন্মাবে না; যা আছে, তা-ও ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যাবে। এ বিষয়ে অধিকাংশের অপ্রিয় হবার সাহস ধর্মকে পুনরায় অর্জ্জন করতে হবে।

দুঃখে ও সংগ্রামে দৃঢ়তা

মনুষ্যত্বসঞ্চার বিষয়ে আর একটি কথা এই যে, ভাবী ভারতের জয়িষ্ণু ধর্ম্মের পক্ষে আর শুধু করুণ হলে চলবে না; তাকে প্রয়োজনানুরূপ কঠোরও হতে হবে। যে-বাড়ীর অভিভাবকগণের অভিপ্রেত থাকে যে ছেলেদের সৈনিকরূপে শিক্ষিত করবেন, সে-বাড়ীতে সে ছেলেগুলিকে তাদের দিদিমার কাছে অধিক দিন রাখা হয় না; একটু পড়ে গেলেই, একটু আঘাত লাগলেই যিনি 'আহা' বলবেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দেবেন,

এমন কোমল প্রকৃতির গুরুজনের কাছে অধিকদিন রাখা হয় না। শীঘ্রই তাদের কঠোরতর শিক্ষকের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনের উপরে ধর্ম্মের একটি করুণ দৃষ্টি আছে। তা-ই আমাদের চিরপরিচিত। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্যদেব, ইঁহারা মানব-জীবনের বিবিধ দুঃখে পরম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে ধর্ম্মকে মানবের নিকটে শান্তির আকারে, সান্ত্বনার আকারে উপস্থিত করেছিলেন। ধর্ম্মের শান্তি, ধর্ম্মের সান্ত্বনা; রোগে শোকে সংসার-সন্তাপে করুণাময় পরম জননীর স্নেহকোলে আশ্রয়,—এ সকল ধর্ম্মরাজ্যের অমৃতময় অনুভূতি। এ সকলের দ্বারা যুগে যুগে অগণ্য দুঃখী তাপী কত বল, কত আশা লাভ করেছে। ধর্ম্মের এই করুণ মূর্ত্তির সম্মুখে আমাদের মস্তক সহজেই নত হয়।

কিন্তু আজ যে আমাদের এ ভারতে অন্যরূপ দিন উপস্থিত! এখন যে আমাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা অন্তর্বিচ্ছেদ দণ্ড-কারাবাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বর তাঁর আশীর্ব্বাদরূপে এক এক সময়ে এক এক দেশের ও এক এক জাতির জীবনে অনেক দণ্ড ও লাঞ্ছনা আনয়ন করেন। আমরা বর্ত্তমান ভারতের অপমান, বিচ্ছিন্নতা ও অধোগতির জন্য অনেক দুঃখ করি বটে, কিন্তু এ দুঃখ লাঞ্ছনা আমাদের আরও অনেক প্রাপ্য রয়েছে। সে প্রাপ্য দুঃখ লাঞ্ছনাকে ভগবানের দণ্ডপ্রসাদ বলে গ্রহণ করতে হবে। আমরা এক একবার স্মরণ করে দেখি, যুগযুগান্তরে আমরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কত পদদলিত করেছি; একই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামান্য প্রণালীভেদ নিয়ে কত লড়াই করেছি; বহুবিবাহের দ্বারা এবং বাধ্যতামূলক চিরবৈধব্যের দ্বারা নারীর কত অবমাননা করেছি; পুরাতন 'নাচ' হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কুৎসিত আমোদ পর্য্যন্ত নানা প্রণালীতে জাতীয় প্রকৃতিকে কত দূষিত করেছি।

এ সকলের একটিরও প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই। আমাদের সম্মুখে এখনও অনেক দুঃখ, অনেক সংগ্রাম অবশিষ্ট রয়েছে। তা' আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

এ সকল সংগ্রাম মনুষ্যোচিত ভাবে বহনের জন্য দেশবাসীর মনকে প্রস্তুত করে, সংকল্পকে দৃঢ় করে, শরীর মনের সকল শক্তিকে উদ্যত করে দেবে কে? উত্তেজনার আকারে নয়, কিন্তু শান্ত অথচ দৃঢ় তপস্যার আকারে জাতীয় জীবনে এ সকল সংস্কার সাধন করবে কে? এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে জাতীয় চরিত্রে সৈনিকের অনুরূপ একটি ভাব জাগিয়ে রাখবে কে?—ভাবী ভারতে জয়িষ্ণু হতে হলে ধর্মকেই তা' করতে হবে।

দুঃখের সম্বন্ধে ধর্মের একমাত্র ভাব—করুণা, সহানুভূতি ও সান্ত্বনা নয়। দুঃখ লাঞ্ছনা ও দণ্ড সম্বন্ধে ধর্মের প্রাচীন করুণ শিক্ষার সঙ্গে এ যুগে যুক্ত করে নিতে হবে, সৈনিকের ন্যায় আনন্দে দুঃখ-বরণের আদর্শটি। এ যুগেও যদি ধর্ম প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে আমার দৃষ্টান্তে বর্ণিত দিদিমার মত আমাদের দুঃখ-বেদনা-দণ্ডের উপরে কেবল কোমল হাত বুলাতে চান, তবে আমাদের বলতে হবে, "না! এ ধর্মে আমাদের কুলাবে না। আমরা চাই ধর্ম আমাদিগকে সৈনিকের কঠোরতা শিক্ষা দিন!" আমরা কবির ভাষায় ঈশ্বরকে বলতে চাই,—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ, সেই ত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ, সেই ত তোমার স্নেহ।

ঐক্য

ভারতে ভিন্ন ভিন্ন রক্তের, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ভিন্ন সমাজরীতির সমাবেশ হয়েছে। এই বৈচিত্র্য বস্তুতঃ দুর্ব্বলতার কারণ নয়; ইহা বলেরই উপাদান হতে পারে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই বিচিত্রতাময় ভারতে জাতীয় জীবন গড়ে দিতে হলে ইহার ভাবী জয়িষ্ণু ধর্ম্মকে একটি প্রবল মিলনাগ্রহসম্পন্ন ও মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। প্রচলিত যে-ধর্ম্মে এই মিলনাগ্রহ ও মিশ্রণ-শক্তি যে পরিমাণে সতেজ, সে-ধর্ম্ম সেই পরিমাণে ভাবী ভারতে মানুষের কাজে আসবে এবং মানুষের চিত্তকে জয় করবে। যে-ধর্ম্মে যে-পরিমাণে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভাবটি প্রবল, সে-ধর্ম্ম সেই পরিমাণে ভাবী ভারতের পথের কণ্টকস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এবং মানুষের অশ্রদ্ধার বস্তু হয়ে পড়বে। এ যুগে যদি কেউ এই স্বপ্ন দেখেন যে ভারতে হিন্দু-প্রধান অথবা মুসলমান-প্রধান ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়ে স্থায়ী হতে পারে, তবে তাঁকে বলতে ইচ্ছা হয়, নদীর জল সাগরে গমন করবে, ইহা যেরূপ অনিবার্য্য ও নিশ্চিত, ভাবী ভারতে এক-জাতীয়তার আদর্শটি জয়যুক্ত হবে, ইহাও তেমনি অনিবার্য্য ও নিশ্চিত। নদীর জলকে বাধা দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, দেরী করিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সাগরে গমন নিবারণ করা যায় না। ভারতে এক-জাতীয়তার স্রোতটিকেও বাধা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, দেরী করানো যায়; কিন্তু সেই স্রোতকে বন্ধ করবার সাধ্য কারও নাই। ভাবী ভারতে প্রত্যেক ধর্ম্ম সেই পরিমাণে জয়িষ্ণু হবেন, যে পরিমাণে এ সত্যকে সম্মান দান করে চলবেন।

ভক্তিসাধনার পথে ঐক্য

কিছুকাল হতে প্রায় প্রত্যেক প্রচলিত ধর্মেই নবীনদের দ্বারা প্রণোদিত নানা নব ধর্মোন্দোলন দেখা দিয়েছে। ভাবী ভারতে এই নব ধর্মান্দোলনসমূহ কি প্রণালীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবে ভারতের এক-জাতীয়তার সহায়তা করতে পারেন, স্বর্গগত আচার্য্য ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি তা প্রকাশ করতে ভালবাসি। একটি ভাল ব্যঞ্জন রান্না হলে আগুনের জ্বালে তার আলু বেগুন পটোল প্রভৃতি প্রত্যেকটি উপাদানের রস প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের রসে প্রত্যেকেরই স্বাদ বাড়ে। ভাবী ভারতে প্রত্যেক নব্য ধর্মান্দোলনকে সেইরূপ একটি কাজ করতে হবে।

ধর্মের রান্নাঘর কোথায়? তার মতে নয়, তার পূজার প্রণালীতে নয়, তার রীতিনীতিতে নয়; কিন্তু তার সাধুভক্তদের জীবনে। ধর্মের রস, ধর্মের স্বাদ সাধু-ভক্তদের জীবনেই থাকে, তাঁদের হৃদয়নিঃসৃত ভক্তিধারাতেই থাকে। ভারতের সমুদয় সম্প্রদায় হতে উত্থিত নব্য ধর্মান্দোলনসকল শুধু স্ব-সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদের নয়, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদের চরিত্রের রস, ভক্তি-প্রেমের রস একত্র মিশ্রিত করুন ও ভারতে তা পরিবেশন করুন। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর সেই দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছিলেন, "ভাল রান্না করা ব্যঞ্জনের আলুকে চেখে দেখ, দেখবে, তাতে পটোলের ও বেগুনের স্বাদ মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।" তেমনি নবযুগে ভারতের প্রত্যেক নব্য ধর্মান্দোলন ভারতে প্রচলিত সকল সম্প্রদায়ের সাধু-ভক্তদের সাধনামৃত আপনাতে একত্র করুন; যেন ঐ নব্য ধর্মান্দোলনসকলের

ফলে ভাবী ভারতে ভাল হিন্দুতে স্বীয় ধর্ম্মরস ব্যতীত ইস্‌লামের ও খ্রীষ্টীয় সাধনার রস পাওয়া যায়, ভাল মুসলিমে স্বীয় ধর্ম্মরস ব্যতীত উপনিষদের ও বাইবেলের রস পাওয়া যায়, ভাল খ্রীষ্টানে স্বীয় ধর্ম্মরস ব্যতীত চৈতন্যদেবের ও মহম্মদের সাধনার রস পাওয়া যায়। যদি নব্য ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল ধর্ম্মের উত্তাপে মানুষগুলির হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে বিগলিত করে দিতে পারেন ও সেই বিগলিত শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা সকল ধর্ম্মের সাধু-ভক্তগণের হৃদয়ামৃতকে আপনার করে নিতে পারেন, তবে তাই হবে ভাবী ভারতের ঐক্যের প্রধান উপকরণ।

উপরে বলা হয়েছে, ভারতের মানব-বৈচিত্র্য প্রকৃত পক্ষে ভারতের দুর্ব্বলতার কারণ। যদি এইরূপ মিলনাগ্রহসম্পন্ন ও মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি প্রবল ধর্ম্মান্দোলন দেশে প্রবাহিত থাকে, তবে বৈচিত্র্যই আমাদের বলের কারণ হবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে পৃথিবীর মিশ্র জাতিরাই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় জাতি। যদি ভারতে একটি প্রবল মিশ্রণশক্তি থাকে, তবে ভাবী যুগে ইতিহাসের এই সত্যটি ভারতেও আবার প্রমাণিত হবে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্যও এইরূপ। ভূগর্ভস্থ অগ্নির প্রবল আলোড়নে ফেল্‌স্পার, কোয়ার্টস্, অভ্র (felspar, quartz, mica) প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কণা একত্র মিশ্রিত হয়ে যায়; পরে তা ভূগর্ভের চাপে অতি দৃঢ় অথচ অতি মসৃণ গ্রানাইট (granite) প্রস্তর রূপে প্রকাশিত হয়। তেমনি ভারতের নব্য ধর্ম্মান্দোলনসমূহে যদি প্রবল মিলনাগ্রহ ও মিশ্রণশক্তি থাকে, তবে প্রধানতঃ ভক্তির উত্তাপ ও আলোড়নের ফলে, ক্রমশঃ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ এক হয়ে যেতে থাকবে। প্রথমতঃ ভাবে আদর্শে বন্ধুতায় এক হবে; ক্রমে বিবাহসূত্রে রক্তেও মিশ্রিত হয়ে যাবে। এইরূপে আগামী কোন

যুগে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দৃঢ় গ্রানাইট প্রস্তরের ন্যায় ঘাতসহ নূতন এক জাতিতে পরিণত হবে।

ইহা এখন আমাদের মানস-স্বপ্ন মাত্র হতে পারে; কিন্তু আগামী যুগে জয়িষ্ণু ধর্ম যদি আমরা চাই, তবে চরম গন্তব্য স্থান মনের সম্মুখে স্পষ্ট করে রাখাই প্রয়োজন। তা স্পষ্ট না থাকলে পথিমধ্যে পথভ্রান্ত হবার আশঙ্কা অনেক।

এই ভবিষ্যতের আশার ছবির জন্য বর্ত্তমান যুগের প্রস্তুতি কিরূপ? শুধু নিশ্চেষ্ট উদারতা যথেষ্ট নয়। এ জন্যই আমি বার বার 'মিলনাগ্রহ-সম্পন্ন' ও 'মিশ্রণশক্তিসম্পন্ন' এই দুটি বিশেষণের ব্যবহার করছি।

ভাবী যুগের প্রতি যাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, এ আদর্শ কি মনকে মাতায় না? সংসারের প্রতি শ্রদ্ধায় উন্নত, কৃতজ্ঞতায় প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল, মনুষ্যত্বে বীর্য্যময়, ভক্তিতে মধুময়, ঐক্যবন্ধনে দৃঢ়,—ভাবী যুগের জয়িষ্ণু ধর্ম্মের এই ছবি, এক ঈশ্বরের পতাকাতলে মিলিত এক ভারতের এই ছবি, ইহা কি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে না? উদ্যমকে জাগরিত করে না? এই জয়িষ্ণু ধর্ম্মকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার সমান আর কোন্ গঠনমূলক কার্য্য ভারতের জন্য আমরা করতে পারি? ঈশ্বর ভারতবাসীকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবনে ও চরিত্রে এই তেজোময় বীর্য্যময় মধুময় ঐক্যময় জয়িষ্ণু ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা সম্মুখের সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

সেবার আদর্শ

দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ জনসেবার আহ্বানটি সর্ব্বদাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ, মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। পূজা উপাসনা যেমন তার একটি অঙ্গ, জীবনকে ও চরিত্রকে উন্নত ও বিকশিত করা তেমনি তার একটি অঙ্গ; দুঃখে বিপদে মানুষের সেবা করা এবং জনসমাজের অন্যায় ও দুর্নীতি সকল দূর করাও তেমনি তার একটি অঙ্গ। মানুষ যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে এ সকলের প্রত্যেক দিক দিয়ে সেই সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করতে হয়।

মানবজীবনের ও মানবসমাজের সকল দুঃখ সংগ্রামই আমাদের কাছে নানা পবিত্র কর্ত্তব্যের অবসর নিয়ে উপস্থিত হয়। মানুষের জীবনের প্রত্যেক বিপদ ও দুঃখ তার নিজের জন্য ঈশ্বরে নির্ভর শিক্ষার অবসর, পরমজননীর কোলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবার অবসর এবং বন্ধুজনের পক্ষে সেই বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি দয়া ও প্রেম প্রকাশ করবার অবসর। আমাদের দয়া ভালবাসা কোথায় থাকত, মানবজীবনে যদি সংগ্রাম না আসত? বুদ্ধ 'বুদ্ধ' হয়েছিলেন, যীশু Man of sorrows এই গৌরবময় আখ্যা লাভ করেছিলেন, John Howard, Florence Nightingale, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মানুষেরা প্রাতঃস্মরণীয় হতে পেরেছিলেন মানবসমাজ দুঃখের আধার বলে।

এই সকল মহাপুরুষ ও মহানারিগণের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ

মানুষের সাধারণ জীবনের কথা ভাবি ; তাতেও দেখতে পাই, আমাদের সব ভালবাসার প্রকৃত সার্থকতা হয় পরস্পরের দুঃখের বোঝা বহন ক'রে। মায়ের মাতৃত্ব কিসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়? সন্তানকে খাওয়াবার সময় নয়, গলা জড়িয়ে তাকে আদর করবার সময় নয় ; কিন্তু স্নেহ দিয়ে তার দুঃখ দূর করবার সময়। মা মনে রাখেন, 'আমার বাছার জন্য সংসারপথে কত ব্যথা আছে, কত কাঁটা আছে ; মানুষের কর্কশ ব্যবহার, তাড়না, ভর্ৎসনা আছে ; তার বিফলতার ও ভগ্ন আশার ক্লেশ আছে, তার রোগশোকের যাতনা আছে।' মায়ের মন পূর্ব্ব হতেই এ সকল ভেবে নেয় এবং তাঁকে যে এ সকল অবস্থার মধ্যে সন্তানকে স্নেহের আশ্রয় দিতে হবে, সন্তানের জন্য মায়ের কর্ত্তব্যটি করতে হবে, তার জন্য মায়ের মন পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকে। এতেই মায়ের মাতৃত্ব। জগতে দুঃখ আছে বলেই মাতৃস্নেহ এমন মূল্যবান।

তেমনি দাম্পত্যপ্রেমে। 'জীবনে দুঃখ আছে, সংগ্রাম আছে, একাকিত্ব আছে, বিফলতা আছে, রোগশোক আছে। সে সকল সময়ে তোমার পাশে দাঁড়াবে কে? তোমার বোঝার অংশ গ্রহণ করবে কে?—আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে তোমার পাশে দাঁড়ালাম'—এই হ'ল প্রকৃত প্রণয়ের কথা! জগতে দুঃখ সংগ্রাম আছে বলেই পারিবারিক প্রেম এত মূল্যবান।

বিশ্বাসী মানুষের মন বলে, 'হে প্রভু, সম্পদ ও স্বাস্থ্যকে তুমি অস্থায়ী করেছ, ভঙ্গুর করেছ। কেন এ বিধি করেছ তার সব মর্ম্ম আমরা বুঝি না। কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু বুঝি যে, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ ও মৃত্যু না থাকলে আমাদের ভালবাসা ফুটত না, জাগত না, তাজা থাকত না।'

তেমনি বিশ্বাসীর মন এ কথাও বলে, 'হে প্রভু, জনসমাজে দুর্ভিক্ষ

ও রোগের আক্রমণ কেন আসে, তা জানি না। কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু বুঝি যে এই সকল ব্যাপক দুঃখ জগতে না এলে জনসমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর পরস্পরের জন্য ব্যাকুল হোত না, পরস্পরের জন্য কাঁদতে শিখত না।'

প্রত্যেক মানুষের যেমন একটি হৃদয় আছে, জনসমাজের এক এক স্তরেরও যেন তেমনি একটি হৃদয় আছে, যদ্দ্বারা সেই স্তরের মানুষ অপর অপর স্তরের মানুষের ভাব বোঝে. আকাঙ্খা বোঝে, দুঃখ-বেদনা বোঝে; যার দ্বারা ধনী ও দরিদ্র, রাজপুরুষ ও প্রজা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, নাগরিক ও গ্রামবাসী, পরস্পরকে বোঝে, শ্রদ্ধা করে, ও সহানুভূতি দান করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এই হৃদয় পরস্পরের সম্বন্ধে যেন উদাসীনতায় নিদ্রিত হয়ে থাকে, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিকৃত হয়ে থাকে। এক এক বার দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি বিপদ এসে আমাদের নিদ্রিত মনকে আমাদের দরিদ্র ভাই বোনদের সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। এই জন্য বলা যায়, এ সকল বিপদ যেন বিধাতার ডাক,—"যাদের কথা ভুলে রয়েছিলে, তাদের কথা আজ ভাব. তাদের জন্য আজ বেদনা অনুভব কর: তাদের জন্য আজ যেটুকু পার, ত্যাগ স্বীকার কর।"

পৃথিবীতে কেন দুর্ভিক্ষ হয়, জানি না। কোন দিন মানুষ সম্যক রূপে জেনে এর শেষ মীমাংসা ও শেষ প্রতীকার করতে পারবে কি না, তা-ও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়, তখন আমাদের কাছে এ বাণী নিয়ে আসে যে, আমাদের কঠিন প্রাণ কাঁদা চাই-ই; আমাদের ত্যাগস্বীকার করা চাই-ই, আমাদের সচ্ছলতা হতে আমাদের উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিত অর্থ হতে একটু কর্তন করে ক্ষুধার্তের জন্য দেওয়া চাই-ই, নতুবা আমাদের ঈশ্বরের নাম করা বৃথা; আমাদের ভদ্রলোক হওয়া বৃথা।

দেশব্যাপী দুঃখ বিপদের এ এক মহান্ অধিকার। ইহা জনসমাজের এক স্তরের হৃদয়কে অপর স্তর সম্বন্ধে সজাগ করে, সদয় করে। কিন্তু দুঃখ বিপদ শুধু কি ধনীর প্রাণকেই দরিদ্রের জন্ত কাঁদায়? তা নয়। আমরা কি রোগের যাতনায়, শোকের বেদনায়, আমাদের দাসদাসীর কিংবা দরিদ্র প্রতিবেশীর সজল চক্ষু দেখে ও সরল সহানুভূতির দুটি কথা শুনে প্রাণে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা অনুভব করি না? মানবজীবনের গভীরতম দুঃখ-বেদনায় সব মানুষ এক হয়ে যায়। পুরাণে বর্ণিত নির্ব্বাসিত রামচন্দ্রের প্রতি গুহকের সদয় ব্যবহারের কথা এবং ইতিহাসে রাজা আলফ্রেডের বিপদে ও রাণা প্রতাপ সিংহের দুঃখে দরিদ্র প্রজাগণের দয়া ও সমবেদনার কথা চির প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। জনসমাজের সেই অতীত যুগের কথা ভাবলেও মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। জগতে এমন একটি যুগ ছিল যখন জনসমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে এইরূপ পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহায়তার সম্বন্ধটিই প্রধান ছিল; সে কথা ভাবলেও মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়, এখন আর যেন তা থাকৃছে না। এখন অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার নামে, অথবা লাভের স্তায়সঙ্গত অংশবিভাগ করে দেবার নামে সেই সমবেদনা ও সহায়তার স্থানে প্রতিযোগিতার নিয়মকে ডেকে আনা হচ্ছে। এ যুগ যেন প্রতিযোগিতার যুগ, কাড়াকাড়ির যুগ, strikeএর যুগ। আমি অর্থনীতিবিৎ নই; আমি এ সকলের ভাল-মন্দ বিচারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু যে-ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীতে পণ্য দ্রব্য ক্রমশঃ সস্তা হয়, কিন্তু জনসমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এক সময়ে পরস্পরের প্রতি যে-আত্মীয়তা বোধ, যে-সমবেদনা ও যে-সহানুভূতিটি ছিল, তা ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে ওঠে, তাকে কিছুতেই জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে আমি মানতে পারি না।

অর্থনীতির প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে ধর্ম্মের দিকে আবার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে

জানি। ধর্ম মানুষের জীবনে যতরূপ কর্ত্তব্য সৃষ্টি করে দেয়, তার মধ্যে প্রধান কর্ত্তব্য মানুষের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দেয় কি? তা প্রেম ও ভক্তি, নির্ভর ও আনুগত্য। তিনি তার নিজের জন্য আমাদের নিকটে আর কিছু চান না। তিনি তার ভক্তকে বলেন, "তুমি আমাকে সেবা করতে চাও? তবে মানুষের সেবা কর। মানুষের সেবা করলেই আমার সেবা করা হয়।" সকল ধর্ম্মেই এই উপদেশ দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম যীশুর মুখ দিয়ে বলেছেন, "যে-সেবা তুমি তোমার সামান্যতম তুচ্ছতম ভাইয়ের জন্য কর, সেই সেবা আমাকেই করা হয়।" হিন্দু-শাস্ত্রের শিক্ষা এই যে ভগবান দরিদ্রের ও আর্ত্তের রূপ ধারণ করে মানুষের সেবা গ্রহণের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন। মুসলমান-ধর্ম্মেও জনসমাজের সেবা করা ও তার কল্যাণার্থ দান করা ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। পাটনায় একজন ৭০ বৎসর বয়স্ক মুসলমান ডাক্তার আছেন। তিনি আমাদের অতি সহৃদয় ও প্রেমিক বন্ধু। বিনা-দর্শনীতে তিনি যে কত দরিদ্রের চিকিৎসা করেন, তার সংখ্যা নাই। একবার ভাই প্রকাশদেবজী তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিলেন। সেই মহানুভব ডাক্তারটি ভাইজীকে বললেন, "আমি এমন কি করেছি, যার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করবো? মানুষের কাজই তো এই, মানুষের জন্ম তো এই জন্য!"—ব'লে তিনি এই উর্দ্দু বচনটি উদ্ধৃত করে শুনালেন,

"দর্দে দিল্‌কে লিয়ে পয়্‌দা কিয়া ইন্‌সান্ কো,
ওর্‌না ইতাঅৎ কে ওয়াস্তে কম্ ন থে করুবো বিয়াঁ।"

অর্থাৎ, "ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেনই কেবল পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হবে বলে; কারণ, তাঁর স্তুতি-বন্দনা করবার জন্য তো স্বর্গের দেবাত্মাগণ যথেষ্ট ছিলেন।" ঠিক কথা! সেই মহান্ পরমেশ্বরের যদি স্তুতি-বন্দনায়

প্রয়োজন হ'ত, তবে উন্নত স্বর্গলোকে অমরাত্মাগণ তাঁর যে-স্তুতি বন্দনা করেন, তা-ই তাঁহার গ্রহণীয় হ'ত! মানবের ক্ষীণ কণ্ঠ ও ক্ষুদ্র বর্ণনা-শক্তি সে বন্দনার তুলনায় অতি তুচ্ছ। কিন্তু ঈশ্বর যে নিয়ে এই মর্ত্ত্যভূমিতে, রোগশোকক্ষুধাতৃষ্ণার ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে মানুষকে জন্ম দিয়েছেন, তা কেবল এইজন্য যে মানুষেরা পরস্পরে ব্যথার ব্যথী হবে! ঈশ্বর দেবতাগণের কাছে চান স্তুতিগান, কিন্তু মানুষের কাছে চান প্রধানতঃ পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও পরস্পরের সেবা।

সংসারক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বের ও প্রতিযোগিতার সীমা নাই। তা' দ্বারা জনসমাজের বায়ু যেন দূষিত হয়ে যায়; মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সহানুভূতি ও 'দরদ' যেন শুকিয়ে যায়। তখন মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ রোগ প্রভৃতি ঝড় বৃষ্টির মত এসে যেন সে বায়ুকে শুদ্ধ করে; যেন মানব-হৃদয়ের রুদ্ধ দয়া ও সমবেদনার স্রোতকে আবার প্রবাহিত করে দেয়। ব্যাপক দুঃখ বিপদের ইহাই পরম সার্থকতা।

ভগবান আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ করেন, সে কল্যাণ ভাল করে লাভ করতে হলে তার জন্য কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়। তেমনি তিনি জনসমাজের ব্যাপক দুঃখের দ্বারা আমাদের যে কল্যাণ করে, তা লাভ করবার জন্যও কিছু সাধনার প্রয়োজন হয়।

প্রথম কথা এই মনে হয় যে, দয়াবৃত্তির চর্চ্চা করতে হলে, সহানুভূতির সাধন করতে হলে দুঃখীকে দেখা চাই, তার সংস্পর্শে আসা চাই। শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি মূলমন্ত্র এই যে, শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন শ্রেষ্ঠ, এবং দর্শন অপেক্ষা স্পর্শ শ্রেষ্ঠ। যে বস্তুটিকে ভাল করে জানতে চাও, তার সম্বন্ধে শুধু শ্রবণ অথবা অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত হয়ো না; তাকে শুধু দেখেও সন্তুষ্ট হয়ো না; তাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর, তার সঙ্গে

যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ সংস্রবের মধ্যে এস। বিশ্ববিধাতা জনসমাজের ব্যাপক দুঃখের দ্বারা আমাদের যে শিক্ষা দিতে চান, তার সম্বন্ধেও সেই কথা। দূর হতে ক্ষুধিতের বিবরণ শুনে সাহায্যের জন্য অর্থদান করা অপেক্ষা ক্ষুধিতকে চক্ষে দেখে দান করাতে অধিক উপকার। যাঁর পক্ষে সম্ভব তিনি শুধু অর্থদান করেই তৃপ্ত হবেন না; আর্ত্ত বা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে নিজে গিয়ে দেখে ও শরীর দিয়ে তার সেবা করতে পারলে অনেক অধিক উপকৃত হওয়া যায়। এই জন্য নিজ প্রতিবেশী অথবা স্বগ্রামবাসী অথবা পরিচিত মানুষের ব্যক্তিগত সেবা করা, দূর হ'তে দান করা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের বিধি এই যে, সুখে দুঃখে মানুষ মানুষের যথাসম্ভব কাছে কাছে থাকবে ও শরীর দিয়ে পরস্পরের সাহায্য করবে। কিন্তু মানুষ নানা কৃত্রিম নিয়ম সৃষ্টি করে পরস্পর হতে দূরত্বই বৃদ্ধি করছে। এখন যেন দয়ার দানটাও কলিকাতার কলের জলের মত নলের সাহায্যেই পরিবেশন করা হয়। ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল নিজে হাতে তুলে ভাইয়ের হাতে দেবার ও তার মুখখানি দেখবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে ওঠে না। এতে আমরা ভগবানের প্রেরিত দুঃখ-বিধির শ্রেষ্ঠ উপকার হ'তেই বঞ্চিত হই।

দ্বিতীয়তঃ, দয়াবৃত্তিচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান সভাসমিতিতে নয়,—নিজ পরিবারে। যার পক্ষে সম্ভব, দরিদ্রের দানের জন্য অর্থদানের সঙ্কল্প সভাসমিতিতে বসে অথবা নিজের অফিস-কক্ষে চাঁদা-আদায়কারীর সম্মুখে বসে না করে নিজ পরিবারের সঙ্গে একত্র বসে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, স্নেহ ভালবাসা যেখানে উদ্রিক্ত হয়, সেখানে সেই স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে এই দয়াবৃত্তিকে মিশতে দিয়ে দানের সঙ্কল্প স্থির করা উচিত। বাঙ্গালীর সব কাজ হুজুগের আকার ধারণ করে। সভাসমিতি না হলে বাঙ্গালীর মনে সৎ সঙ্কল্প জাগে না। জাতীয় জীবনের সারবত্তার

লক্ষণ এ নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতে আছে, তিনি লণ্ডনে যে পরিবারে বাস করতেন, তা একটি দরিদ্র পরিবার ছিল। সেই পরিবারের মাতা ও বয়স্কা কন্যাগণ পর্দ্দা সেলাই করতেন, বৃদ্ধ পিতা তা ফেরী করে বিক্রয় করতেন; এইরূপে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত। প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক হিসাব শেষ করবার পর সেই পরিবারে প্রায় এইরূপ আলোচনা হ'ত যে, "সংবাদপত্রে দেখা গেল, অমুক স্থানে একটি জনহিতকর কার্য্যের সূচনা করা হয়েছে; এস দেখি, আমরা তাতে কি সাহায্য করতে পারি।" হিসাব করে সপ্তাহের উদ্বৃত্ত অর্থ হতে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করা হ'ত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, সেখানে ভাল ভাল পরিবারে এইরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দান করা পারিবারিক জীবনের, পারিবারিক সম্মিলনের, পারিবারিক সুখশান্তি সম্ভোগের একটি অঙ্গস্বরূপ। সেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে এইরূপে habit of giving-এর চর্চ্চা করা হয় বলে কোনও সৎকার্য্য অর্থাভাবে নষ্ট হয় না। সে দেশে জনসমাজের অর্থ সদনুষ্ঠানের দিকে জল যেমন নিম্নাভিমুখে আপনি ধাবিত হয়, তেমনি আপনা আপনি প্রবাহিত হয়। আর এ দেশের কি বিপরীত অবস্থা! কত কাকুতি মিনতির অথবা কত বক্র প্রলোভনের সাহায্যে এ দেশে সৎকাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয়! কবে বাঙ্গালীর পরিবারে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মের পরিবারে, এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ধারাটি প্রবর্ত্তিত হবে?

কলিকাতায় আমার একজন ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন, তিনি বাঙ্গালী ন'ন। তিনি সৎকার্য্যে দানের জন্য নিজ আয়ের একটি নির্দ্দিষ্ট শতকরা হার স্থির করে রেখেছেন। আমাকে মাঝে মাঝে কোন কোন দরিদ্র পরিবারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে তাঁর কাছে যেতে হয়। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁর কাছ থেকে এরূপ কাজে অর্থ চাইলে তিনি আমার কাছে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; বলেন, "আমার অর্থের সদ্ব্যয়ের উপায় দেখিয়ে দিয়ে আপনি আমার পরম উপকার করেছেন।" একবার যখন তাঁদের ব্যবসায়ে খুব আয় হচ্ছিল, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ধর্মের জন্য ও দরিদ্রের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট টাকা আমাদের কাছ থেকে নেবেন; দেখবেন, যেন আমরা ধনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে না পড়ি।" কয়েকদিন হ'ল ব্রাহ্মসমাজের কোনও কাজের সাহায্যের জন্য তিনি আমার হাতে কিছু টাকা দেবেন বলে স্বীকার করেছিলেন। পরদিন কিছু টাকা ও সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে এক পত্র এসে উপস্থিত। পত্রে তিনি লিখেছেন, "কাল অফিসে গিয়ে দেখলাম, আমার এক কর্ম্মচারীর একটি ভুলের জন্য হঠাৎ আমার এক হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এই ক্ষতির জন্য আপনাকে প্রতিশ্রুত টাকা দেবার আমার আর উপায় ছিল না। কিন্তু অমুক তারিখে আমার স্ত্রীর জন্মদিন। জন্মদিনে তাঁকে আমি তাঁর নির্ব্বাচিত কোনও বস্তু উপহার দেব বলে কিছু টাকা রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী আপনা হতে সেই উপহারের পরিবর্ত্তে এই টাকাটা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। এই টাকা তাঁরই দান বলে গ্রহণ করবেন।" এই বন্ধুর ও বন্ধুপত্নীর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। ইঁহাদের কথা স্মরণ করলে হৃদয় উন্নত হয়। পতি, পত্নী ও সন্তান, সকলে মিলে পরামর্শ করে সৎকাজে এইরূপ অর্থদান এবং "দান করে আমরাই ধন্য হলাম"—এইরূপ অনুভব ব্রাহ্মদের পরিবারে পরিবারে করে এই ধারাটি প্রবর্ত্তিত হবে?

স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে একত্রে পরামর্শ করে দানের সঙ্কল্প করলে, সে-দানের সঙ্কল্পের দ্বারা আপনাদের নিত্য ব্যয়ের অঙ্ককে নিয়মিত করলে এবং "দান করে আমরা ধন্য হচ্ছি" এই ভাবের দ্বারা চালিত হয়ে

দান করলে যে-উপকার হয়, সভাসমিতির উত্তেজনার মধ্যে দানের সঙ্কল্প করলে সে উপকার লাভ হয় না। ভগবানের বিধি এই যে, জনসমাজের প্রত্যেক ব্যাপক দুঃখ তার প্রত্যেকটি পরিবারের হৃদয়কে আলোড়িত করবে ও সে পরিবারের দয়াবৃত্তিকে সতেজ রাখবে। যেমন ব্যক্তিগত দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনকে সুদৃঢ় ও সারবান করে তোলে, জনসমাজের ব্যাপক দুঃখও তেমনি জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ও সারবান করে তুলবে। সেই সারবত্তা সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পরিবার; সভাসমিতি নয়।

দানের মূল্য ত্যাগে, সহানুভূতিতে ও শ্রদ্ধায়। দুর্ভিক্ষের জন্য বা কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য আমোদের আয়োজন করে পাঁচ হাজার টাকা তোলাতে জনসমাজের যে-উপকার হয়, মানুষের বিশুদ্ধ দয়াবৃত্তিকে জাগিয়ে ও শুধু তাকে স্পর্শ করে পাঁচ টাকা তোলাতে তার অপেক্ষা অধিক স্থায়ী উপকার হয়। যদি জনসমাজ দিনে দিনে এই অভ্যাসের শিক্ষাটি পায় যে, আমোদ না হলে টাকার মুষ্টি খুলব না, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা যাবে যে, জনসমাজের হৃদয় হতে দয়াবৃত্তি এবং তদানুষঙ্গিক সমুদয় শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে; এক সর্ব্বগ্রাসী আমোদ-স্পৃহাই সে সকলের স্থান অধিকার করছে। মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠবৃত্তিসকলকে জীবিত রাখা, অম্লান রাখা, সতেজ রাখা ব্রাহ্মসমাজের সব চেয়ে বড় কাজ। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজ হতে আমরা এ কথা বলি,—"আমোদের সর্ত্ত করে সাহায্য দান ক'র না। কিন্তু, দুঃখীর জন্য ব্যথিত হয়ে দান কর, আপনাকে কোনও বিষয়ে বঞ্চিত করে দান কর; 'দান করে আমরা ধন্য হই', ইহা অনুভব করে করে দান কর; ক্ষুধিতের জন্য কিছু না করলে নিজের অন্ন মুখে তুলতে পারি না, মনকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে দান কর।"

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন হতে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। একদিন তিনি বেলা দশটার সময় স্নান করে স্নানের ঘর হতে নিজ কক্ষে যাবার পথে রন্ধনশালার দ্বারে এসে পত্নীকে বলে গেলেন, "আমার ভাত বাড়।" তৎপরে নিজ কক্ষে গিয়েই সমাগত একজন লোকের মুখে শুনলেন যে অমুক দরিদ্র ব্রাহ্মের বাড়ীতে অত্যন্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত; এমন কি, আজ সকালে এখন পর্য্যন্ত তাদের রান্নার কোনও আয়োজন হয় নি। শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চাদর ছাতা ও কয়েকটি টাকা নিয়ে ঘর হতে বের হলেন। ভাত বাড়া হচ্ছিল, তা রেখে দিতে বললেন। প্রস্তুত অন্ন আহার করে বাইরে যাবার জন্য পত্নী কত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তিনি তা শুনলেন না। নিজে বাজারে গিয়ে চাল ডাল তরকারী ইত্যাদি ক্রয় করে মুটের মাথায় তা দিয়ে সেই দরিদ্রের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের রন্ধনের আয়োজন করতে বলে এবং সহৃদয় বাক্যে তাদের আশ্বস্ত করে বাড়ী ফিরে এলেন। এসে পত্নীকে বললেন, "এইবার আমায় ভাত দাও।"

সাধু পুরুষের এইরূপই ব্যবহার! যার মধ্যে মানুষের প্রাণ আছে, তার মনের অবস্থা এইরূপই হয়। দুঃখীর দুঃখের কথা শুনলে সে স্থির থাকতে পারে না। আমাদের যে প্রতিদিন বাড়া ভাত রেখে দিতে হবে তা নয়; কিন্তু প্রতিদিন অন্নগ্রহণের পূর্ব্বে যেন নির্ম্মল বিবেকের এই বাণী শুনতে পাই যে, ক্ষুধিতের জন্য আমার যেটুকু করবার ছিল, আমি তা করেছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৬

দাম্পত্য জীবন

হে সৌম্য, হে কল্যাণি, আজ তোমরা দু'জনে সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের প্রসাদে ও তাঁরই পবিত্র সন্নিধানে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে। যা' মানবজীবনের পবিত্রতম সম্বন্ধ, দুজনের ভাবী সুখ দুঃখ ও কল্যাণ যার উপরে গভীরতম ভাবে নির্ভর করে, সেই সম্বন্ধের দ্বারদেশে তোমরা উপস্থিত। আজ তোমরা ঈশ্বরের স্পর্শ, ঈশ্বরের হাত জীবনে বিশেষ ভাবে অনুভব কর। কে তোমাদের আজ মিলিত করছেন? আজ শুধু তোমাদের পরস্পরের মনোনয়নকে দেখো না; শুধু অভিভাবকগণের সম্মতি এবং সমাজের ও আইনের অনুমোদনকে দেখো না। তোমাদের দৃষ্টিই বা কতদূর যায়? তোমাদের উভয়ের অভিভাবকগণের ব্যাকুল দৃষ্টিই বা কতদূর যায়? যিনি তোমাদের প্রকৃত অভিভাবক ও প্রভু, আমাদের সকলের দৃষ্টির অতীত স্থানে যাঁর দৃষ্টি প্রবেশ করে, সেই পরম মঙ্গলময়কে তোমরা দেখ। মানব-প্রকৃতির সকল আকর্ষণের ভিতরে যাঁর শক্তি, মানব-অন্তরের সকল মহৎ সঙ্কল্পের ভিতরে যাঁর প্রেরণা, মানুষে-মানুষে সকল সম্বন্ধের ভিতরে যাঁর হস্তের বন্ধন, যিনি মানবচিত্তের মানবজীবনের মানবগৃহের মনুষ্যসমাজের একমাত্র নেতা ও বিধাতা, সেই পরম সত্যস্বরূপের হাত তোমাদের এই মিলনের মধ্যে তোমরা দর্শন কর। এই মুহূর্ত্তে একবার তোমরা আর সব ভুলে যাও। এই বিবাহ-সভা, এই সমারোহ, মানব-রচিত এই সমুদয় ব্যবস্থা ক্ষণকালের জন্য সব ভুলে যাও। একবার অনুভব কর সেই সত্যস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে, যাঁর চরণতলে তোমরা দুজনে মিলিত হয়ে

বসেছ, যাঁর সম্মুখে তোমরা পরম প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলে। এই পুণ্য-মুহূর্ত্তে তাঁকে একবার এমন সত্য বলে দেখ, যেমন এ জীবনে আর কখনও দেখ নাই ; এই পুণ্য-মুহূর্ত্তে তাঁকে মনে মনে এমন কাতর হয়ে ডাক, যেমন এ জীবনে আর কখনও ডাক নাই।

স্নেহভাজন পুত্র কন্যা বয়স্ক হয়ে যদি পৃথিবীর কোনও নূতন দেশে যাত্রা করেন, পিতা মাতা ও গুরুজন কত ব্যস্ত হয়ে তাদের কাছে পথের সংবাদ বলে দেন, পথের সম্বল বিষয়ে পরামর্শ দেন। আমরা তোমাদিগকে তোমাদের এ পথে কোন পাথেয় দেখিয়ে দেব ? জগতের সাধু ভক্তগণের পরীক্ষিত, যুগে যুগে সকল বিশ্বাসী দম্পতীর পরীক্ষিত, তোমাদের উভয়ের পিতামাতার জীবনে পরীক্ষিত, সুখের দুঃখের, সম্পদের বিপদের, আলোকের অন্ধকারের একমাত্র সম্বল, একমাত্র পাথেয়, ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর ও তাঁর চরণে প্রার্থনা। তোমরা সুখে তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করো ; সুখ তোমাদের মলিন করবে না। দুঃখে তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করো ; দুঃখ তোমাদের অবসন্ন করবে না। রোগে বিপদে শোকে তাঁর চরণে প্রার্থনা করো ; সে সকল বিপদে তোমাদের বল বৃদ্ধি করবে। যদি কোন দিন পরস্পরে সংশয় আসে, যদি কোন দিন ঈশ্বরে সংশয় আসে, তখনও অন্ধকারে পতিত দুই শিশুর মত কেবল প্রার্থনাই করো ; অন্ধকারে আলো ফুটবে। ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা ও তাঁহার করুণায় নির্ভর,—জীবনের সকল পথে মানবের ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্বল।

এখন থেকে তোমাদের দুজনের নিজস্ব একটু জীবন হতে চললো। অনেক লোকের মধ্যে বাস করলেও তোমাদের সেই মিলিত জীবনটুকু যেন আর সকলের থেকে ঘেরা একটু স্বতন্ত্র জীবন হয়। সেখানে কেবল তোমরা দুজনে থাকবে ও তোমাদের ঈশ্বর থাকবেন। তোমাদের সেই

নিজস্ব জীবনটুকুতে তোমরা ঈশ্বরের আসনখানি ভাল করে প্রতিষ্ঠিত করবে, এই সঙ্কল্প গ্রহণ করো। অন্যের সঙ্গে মিলিত ভাবে ঈশ্বরচরণে দিবসের মধ্যে বহুবার বসলেও তোমাদের সেই মিলিত জীবনটুকুতে প্রতিদিন স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের চরণে বসা চাই। নিয়ম পালনের জন্য নয়; কিন্তু যাতে তোমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম নিত্য নির্ম্মল থাকে, যাতে মানুষের সঙ্গে সকল ব্যবহার নিত্য উদার ও মহৎ থাকে, যাতে মনের সকল গতি ঊর্দ্ধমুখীন ও জীবনের লক্ষ্য উন্নত থাকে, সেই কামনা নিয়ে প্রতিদিন তাজা কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে প্রেমে মনকে পূর্ণ করে তোমরা দুজনে ঈশ্বর চরণে বসবে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে উন্নত দাম্পত্য-সম্বন্ধ মানব-অন্তরে যে অনুপ্রাণন সঞ্চার করে, অন্য কোনও মানবীয় সম্বন্ধ তা পারে না। এজন্য আমি দাম্পত্য-সম্বন্ধকে বড় পবিত্র চক্ষে দেখি এবং উন্নত অন্তরে মানুষকে এ জীবনে প্রবেশ করতে দেখলে বড় উৎসাহিত হই। যতক্ষণ শিশু মাতৃগর্ভে থাকে, ততক্ষণ তার দেহের সর্ব্বাঙ্গে রক্তস্রোতকে সঞ্চালিত রাখে মাতার হৃৎপিণ্ড। ভূমিষ্ঠ হবামাত্র সেই কার্য্যটি করতে আরম্ভ করে শিশুর নিজের হৃৎপিণ্ড। তাই, সেই মুহূর্ত্ত হতে শিশুদেহে রক্তধারার গতিটি পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়; দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে সজীব রাখে যে-রক্তধারা, তা নূতন স্থান হতে উৎসারিত হতে আরম্ভ হয়। তেমনি, দাম্পত্য-জীবনে নব জন্ম লাভ করবামাত্র পতি-পত্নীর পরস্পরের প্রতি প্রেমই হয়ে দাঁড়ায় মিলিত জীবনের নিয়ামক নূতন হৃৎপিণ্ড। তখন হতে তাদের প্রাণের আর সকল ভালবাসাতে, পৃথিবীর আর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধে এবং জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণন আসতে থাকে উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেম হতে। এই প্রেম যদি উন্নত হয়, পবিত্র হয়, সতেজ হয়, তবে সমগ্র জীবনে কি

খোতা! এই প্রেম যদি হীন হয়, মলিন হয়, শীর্ণ হয়, তবে সমগ্র জীবনে কি ব্যর্থতা! এই জন্ত ব্যাকুল হয়ে তোমাদের বলি, প্রতিদিন তোমাদের এই সম্বন্ধকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের দ্বারা, তাঁর আদেশ পালনের দ্বারা, তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনার দ্বারা সরস ও পবিত্র রাখবে।

যার প্রকৃতিতে গভীরতা আছে, মনুষ্যত্ব আছে, এমন মানুষের কাছে সংসারের প্রত্যেক প্রেম, প্রত্যেক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পবিত্র; তার কাছে ইহার প্রত্যেকটি সেই পরম অভিভাবকের হাতখানি ধরে উন্নত ও উজ্জ্বল জীবনের দিকে ওঠবার সোপান। সুখ, তাকে কোমল করে, কৃতজ্ঞ করে, লঘুতার দিকে নিয়ে যায় না; দুঃখ, তার অন্তরে ঈশ্বরে নির্ভর ও মানবে সহানুভূতির ভাব এনে দেয়, বিরক্তি ও অবিশ্বাস এনে দেয় না; কর্ত্তব্য, তার শক্তি সকলকে জাগরিত করে, কিন্তু হৃদয়কে কঠোর করে না।

পরস্পরের স্বাধীনতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেও পরস্পরের সঙ্গে ইচ্ছা রুচি মতামত মিলিয়ে নিতে হবে। দুজনের মধ্যে যে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে তাকে প্রাধান্য দিয়েও জগতের আর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধকে নিত্য সজীব রাখতে হবে। কিসে তা' সম্ভব হয়? তোমরা দুজনেই নানাবিধ শিক্ষালাভ করেছ। কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে, এ পথে চলতে গিয়ে সেই পূর্ব্বার্জ্জিত শিক্ষাতে আর কুলাবে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা, প্রতিজ্ঞার বল,—এ সকলের দ্বারা সুন্দর ও সফল কর্ম্মজীবন আয়ত্ত হতে পারে, অর্থোপার্জ্জনের জীবন আয়ত্ত হতে পারে। কিন্তু শুধু এ সকলের দ্বারা সুন্দর ও সফল বিবাহিত জীবন আয়ত্ত হয় না। তাই বিধাতা তরুণ হৃদয়ে ছোট একটি সোণার প্রদীপের মত প্রণয়ের আলোটি জেলে দেন। তোমাদের অন্তরের সেই প্রেমকে তোমরা খুব উজ্জ্বল করে তুলো; দেখ্‌বে, সব প্রশ্নের মীমাংসা কেমন সহজ হবে।

দেখ্‌বে, সেই প্রেম শুধু জীবনের একটি নূতন আনন্দমাত্র নয়। দেখ্‌বে, তা' একটি অনল, যা আমিত্বকে গলিয়ে লুপ্ত করে দেয়; তা' একটি আলোক, যা মানুষের সঙ্গে চলবার সব কঠিন প্রশ্নে পথ দেখায়; তা' একটি বল, যা সারাজীবনে সব ভার বহন করতে, সব আঘাত সহ্য করতে মানুষকে সমর্থ করে। সেই পবিত্র প্রেম তোমাদের দুজনের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

তোমরা তোমাদের মিলিত জীবনে পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে এমন স্মরণে রেখে চলবে, বিবেককে জীবনে এমন প্রাধান্য দিয়ে চলবে, যেন তোমাদের জীবন সুখলোলুপতার দিকে গড়িয়ে যেতে না পায়। বিবাহিত জীবনের প্রধান প্রলোভন এই যে, প্রণয়কে শুধু সুখ আহরণ ও সুখ বিতরণের উপায় বলে দেখতে ইচ্ছা হয়। আপনি সুখী হব ও প্রেমাস্পদকে সুখী করব, এর অধিক আর কিছু মনে থাকে না। যেদিন আমোদ-প্রমোদের জন্য দুজনে বেড়াতে যাওয়া যায়, এমন দিনের পক্ষে ঐ মনোভাব উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ভগবান তো মানব-জীবনকে একটি দীর্ঘ প্রমোদের অবসর মাত্র করে সৃষ্টি করেন নি। যারা দাম্পত্য জীবনে কেবল সুখের সাহচর্য্য অন্বেষণ করে, তাদের পরিণাম হয় অশান্তি ও তিক্ততা। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের স্বভাব তা নয়। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম উভয়ের ত্যাগের দ্বারা নিত্য সতেজ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা নিত্য সংযত; কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগের দ্বারা, লক্ষ্যসিদ্ধির পথে মিলিত আত্মোৎসর্গের দ্বারা নিত্য উন্নত। এইরূপ উন্নত প্রণয় পতি-পত্নির জীবনকে মহত্বে ও মাধুর্য্যে পূর্ণ করে; দাম্পত্য জীবনকে তপস্যায় ও গৃহকে তপোবনে পরিণত করে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেছেন, "একদিনের বিবাহ-অনুষ্ঠানেই বিবাহ

পূর্ণ হয় না। ইহা কেবল প্রেমের নিত্য নব বিকাশ এবং পুণ্যের চির উন্নতি। বিবাহ-অনুষ্ঠানটি ভবিষ্যৎ মহোচ্চ আধ্যাত্মিক মিলনের নিদর্শন মাত্র। হে দম্পতী, তোমরা দিনে দিনে অধিক অধিক বিবাহিত ও আত্মায় আত্মায় অধিক অধিক মিলিত হইতে থাক।"

হে সৌম্য, তোমাকে তোমার বাইরের কাজের জন্য কত স্থানে ঘুরতে হবে, কত দেশ বিদেশে যেতে হবে। তুমি সংসারে গিয়ে দেখবে, কেউ বা ধর্ম্ম ও নীতিকে তুচ্ছ করছে; কেউ বা পবিত্রতা ও মহত্ত্বের আদর্শকে পরিহাস করছে, কেউ বা শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও হৃদয়ের সর্ব্ববিধ কোমলতাকে অবজ্ঞা করছে; অনেকে আমোদ আহ্লাদ ও অর্থসঞ্চয়কেই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রকাশ করছে। তুমি যেখানেই যাও, যে-কাজেই নিযুক্ত হও, যে-সঙ্গের দ্বারাই বেষ্টিত থাক, ভগবান যে-শৃঙ্খল দিয়ে তোমার প্রাণটিকে তাঁর নিজের চরণের সঙ্গে, তোমার পূজ্যগণের সঙ্গে, তোমার বাড়ীখানির সঙ্গে, তোমার সমাজের সঙ্গে, তোমার জীবনের মহৎ আদর্শের সঙ্গে, তোমার নিত্য কল্যাণের সঙ্গে বেঁধে রাখবেন, সেই শৃঙ্খল তিনি আজ প্রস্তুত করছেন, তুমি তা দর্শন কর। এই বন্ধনের কাছে ধরা দিতে কখনও সঙ্কুচিত হয়ো না। তুমি বাইরের যে কর্ম্মেই নিযুক্ত হও না কেন, যে উচ্চ অভিলাষই তোমার মনকে মত্ত করুক না কেন, পরিবার সমাজ ও ঈশ্বর, এই তিনের কাছে তুমি আপনাকে নিত্য বাঁধা রাখবে। এই তিনের কাছে তুমি আপনাকে বিক্রীত বলে নিত্য অনুভব করবে।

হে কল্যাণি, যে-গৃহে বধূরূপে যাচ্ছ, সেখানে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দ্বারা, বিনয় ও সেবার দ্বারা যেন তুমি সকলের হৃদয় অধিকার করতে পার, তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করি। এ সংসারে মানুষ নত হয়েই উন্নত হয়; আপনাকে মুছে ফেলেই সকলের হৃদয়ে রাজত্ব

করে। এ সাধনায় পুরুষ অপেক্ষা নারী কত সহজে সফলতা লাভ করেন! নববধূ গৃহের সেবিকা হ'য়েই গৃহের সম্রাজ্ঞী হন। তুমি তোমার নবগৃহে সেইভাবে রাজত্ব কর। সেই বৈদিক আশীর্ব্বাদ "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব, ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু," তোমার জীবনে সফল হোক।

স্বামী যতই কর্ম্মব্যস্ত হোন না কেন, মিলিত জীবনের প্রত্যেকটি দিনে "এস আমরা দুজনে ঈশ্বরের চরণে বসি" এই কথাটি বলা এবং "এস, আমরা হৃদয়ের স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তিকে খুব তাজা করে রাখি" বার বার এ কথাটি বলে সেই দিকে মন দুটিকে ফিরিয়ে রাখা,—ইহা চিরদিন নারীরই কাজ। তোমাদের পরিবারে এ কাজটি করবার জন্য তুমি তোমার অন্তরকে আজ হতে দৃঢ় সঙ্কল্পে বাঁধ।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, সাধু ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ, সকল সাধু সাধ্বী দম্পতির আশীর্ব্বাদ, তোমাদের উভয় বংশের পূর্ব্বগামিগণের আশীর্ব্বাদ, অন্যান্য সকল গুরুজন ও বন্ধুজনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে নিয়ে তোমরা তোমাদের নবজীবন-পথে অগ্রসর হও!